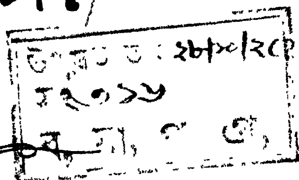
উচ্ছ্বাস।



শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র বি, এ

প্রণীত।



কলিকাতা

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট্,

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩১৬

 [মূল্য ৸৹ বার আনা।

কলিকাতা
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যে সাধকোত্তমের স্বাধীনোচ্ছাসে ভাবরাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত
হয়, যে বাগ্মিপ্রবরের গৈরিকনিস্রাব তুল্য ওজস্বিনী ভাষার
প্রবাহে নীরস-হৃদয় সরস হয়, যাঁহার দেবানু-
প্রাণিত শাস্ত্রব্যাখ্যায় পাষাণ হৃদয় বিগলিত
হয়, যাঁহার গুরূপদেশে ও তত্ত্ব-
মীমাংসায় অজ্ঞানান্ধকার বিদূ-
রিত হয়, যাঁহার লেখনীমুখে
ভাষার দৈন্য ঘুচিয়া যায়
সেই
অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক, অন্বর্থোপাধিক, ঋষিকল্পমূর্ত্তি
পরমারাধ্যতম
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব
মহোদয়ের শ্রীচরণারবিন্দে
আমার উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ের এই সামান্য অভিব্যক্তি
এবং সাহিত্য সেবার এই সামান্য অভিজ্ঞান—
"উচ্ছ্বাস"
পরম ভক্তিতে, পরম প্রীতিতে ও পরম সমাদরে
সমর্পিত হইল।

বেলফুলিয়া,
খুলনা।
২৫শে আশ্বিন, ১৩১৬।

দাসানুদাস
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

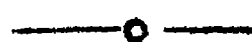
বিজ্ঞাপন।

যে নয়টি প্রবন্ধ দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের দেহ গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম এই চারিটি প্রবন্ধ নূতন লিখিত। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি "শিল্প ও সাহিত্য" নামক মাসিক পত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অন্তরের ভাব সমাজে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য কিনা, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই। আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করি নাই। মনে যে ভাব যে ভাবে উঠিয়াছে, তাহা সেই ভাবেই সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম। আমার কার্য্যের বিচারক আমি নহি; তবে আমার দোষ আমার মত কেহ জানেন না এবং তজ্জন্য আমিই দায়ী রহিলাম। শৈবাল স্রোতে ভাসিল; কে জানে কোথায় যাইবে?

দৌলতপুর কলেজ
খুলনা
২৫শে আশ্বিন, ১৩১৬।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।



সূচী।

উচ্ছ্বাস।

আমি অন্ধ।

(রাজধানীর রাজবর্ত্মে এক অনাথের গান)

"আমি অন্ধ"—এ কি সঙ্গীত! এ যে কেমন প্রাণ-মন উদাস করা, এ যে কেমন আত্ম-ভুলানো, আত্ম-হারাণো মনোহারী মধুর সঙ্গীত! এই বৈশাখী সায়াহ্নে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, মেঘগম্ভীর স্বরে—মেঘমল্লারে পথিক! কেন তুমি গাহিতেছ—"আমি অন্ধ?"

ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ; প্রকৃতি নীরব; বাহ্যজগৎ নিস্পন্দ; মানবমণ্ডলী স্তম্ভিত ও ভীত। ঐ দেখ, ঐ নবীন নীল-নীরদে অম্বরতল সমাচ্ছন্ন; গুরুগম্ভীর গর্জ্জিত-নাদে ঘনঘটা বিকম্পিত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে দামিনী খেলিতেছে—আর ভয়ে যেন শিহরিত তনুতে রক্তাক্ত সূর্য্যদেব অস্তাচল-গহ্বরে আরও লুক্কায়িত হইতে চেষ্টা করিতেছেন; তাই দেখিয়া জীব-জগৎ ত্রস্ত ও শশব্যস্ত। এই সময়ে, প্রকৃতিদেবীর এই ভীষণ প্রকৃতি দেখিয়া, আর সমাগতপ্রায় অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারের কথা মনে ভাবিয়া, তোমার কি ভয় হইতেছে না? তোমার কি জীবনের প্রতি মায়া নাই? তবে গৃহপানে ফিরিতেছ না কেন? তোমার কি গৃহও

নাই? গৃহপানে ফিরিতে সাধ নাই? সাধ লইয়া জীবন ধারণ করিতে কি আশা নাই? আশা না লইয়া লোক বাঁচে কিরূপে? পথভ্রান্ত! ক্লান্ত-কলেবরে যাইতেছ কোথায়? সম্মুখে ত আশ্রয়স্থান নাই! ঐ যে অদূরে মেঘমণ্ডিত দিগঙ্গনার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য ঘনচ্ছায়ায় কালিমাকায়া ধারণ করিয়া, তরঙ্গায়িতা গঙ্গা কল্লোল-কোলাহলে প্রবাহিত হইতেছে। তুমি ক্ষুদ্র পথ দিয়া উহারই পানে অগ্রসর হইতে হইতে পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদমালা প্রকম্পিত করিতে করিতে, কাতর—তাই কোমল, দুঃখার্ত্ত—তাই মধুর স্বরে গাহিতেছ—"আমি অন্ধ!"

পথিক! তুমি নিশ্চয়ই অন্ধ; নতুবা এ প্রকৃতির ভয়াল মূর্ত্তি দেখিয়া কে না আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হয়? নিজের পথ কে না দেখে? ব্যস্ত ত্রস্ত হইয়া পরিবারমণ্ডলীকে দেখিবার জন্য কে না গৃহপানে ছুটে? তোমার যেন কোথায়ও কোন টান নাই, দাম্পত্য-বন্ধন নাই, আত্মীয়স্বজন নাই, স্নেহমমতার আকর্ষণ নাই; তাই বুঝি তুমি অবসাদে, নিরুদ্বেগে, নিঃসন্দেহে—নির্লিপ্তমনে গাহিতেছ—সেই একই গান—"আমি অন্ধ!"

এ গানের অর্থ কি গায়ক? এ গানটি তোমার এত প্রিয় কেন? এ সুর তোমার কণ্ঠে এত স্বাভাবিক কেন? এ গান কি তোমার স্ব-রচিত? আচ্ছা, প্রকৃতই কি তুমি অন্ধ?—দর্শন-শক্তি রহিত? তাই বুঝি তুমি চলিতে চলিতে পথের লোকের গায়ে গিয়া পড়িতেছ! তাই বুঝি তোমার স্বর এত দুঃখার্ত্ত? তা' যে আগে বুঝিতে পারি নাই! বুঝিব কেমন করিয়া? হীনমতি সংসারী হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিব কেমন করিয়া? জগতের নিগূঢ় রহস্যের ভিতর প্রবেশ করিব কেমন করিয়া? লীলাময়ের লীলাভঙ্গি আয়ত্ত করিব কেমন করিয়া? বুঝিব

কেমন করিয়া যে এ ঘোর দুর্দ্দিনে—সম্মুখে ঘোর অমানিশি, ভীমবেগে বাত্যারম্ভ সমাগত—এমনই সময়ে রাজপথের কাঙ্গাল তুমি একাকী পথিক! তোমার সহায় সম্পদ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, আবাস-আশ্রয় কিছুই নাই—আশ্রয় খুঁজিয়া লইবারও সাধ্য নাই—কারণ তোমার চক্ষু নাই। তাই বুঝি ভয়ে ও দুঃখে ঐ চির-নিমীলিত নেত্র-পদ্মের মধ্য হইতে নীরধারা প্রবাহিত হইতেছে! তাই বুঝি নিজে কাঁদিতেছ, এবং নিজের অবস্থা জগৎকে জানাইবার জন্য, প্রবল সত্যের অভিব্যক্তি করিতে করিতে গাহিতেছ—"আমি অন্ধ!"

দুঃখ-দুর্ব্বিপাকের যে জ্বলন্ত, জীবন্ত চিত্র মানবিক কল্পনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, তোমাতে তাহাই প্রকটিত। তোমার আত্মসম্বল নাই; জীবিকারও বুঝি সংস্থান নাই। ঈশ্বরের দয়ায় বঞ্চিত হইয়া, ভিখারী, তুমি পরের নিকট চাহিতেছ দয়া—আর গাহিতেছ—"আমি অন্ধ!"

কিন্তু জগদীশ্বরের দয়ায় বঞ্চিত হইলে, দয়াময়ের দয়া না পাইলে কি মানবের দয়া পাওয়া যায়? দেখিতেছ না, তোমাকে দেখিয়া—তোমার শীর্ণদেহ আর জীর্ণ বেশ—তোমার ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ আর শত-গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দেখিয়া, কত পরিহাসপরায়ণ যুবকের হাস্যোচ্ছাস পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, কত রোষকষায়িত দুর্ব্বৃত্ত বালকের রুক্ষ-নেত্রে রঙ্গভঙ্গি প্রকটিত হইতেছে—আর কত সংসার-সংস্কার-বর্জ্জিত শিশুর হসিতবদনে রক্তোৎপল-প্রোদ্ভিন্নপথে মুক্তাপংক্তি দেখা যাইতেছে? দেখিতেছ না দৈবযোগে কোথায়ও বা জনৈক স্থবিরের দীর্ঘশ্বাস-প্রকম্পিত বদন-মণ্ডলে জীর্ণ সহানুভূতির দীন রেখা, কোথায়ও বা বর্ষীয়সী জননীর

বিক্ষুব্ধ নয়নকোণে বিগলিত-হৃদয়ের সজল অভিব্যক্তি, আবার কোথায়ও বা শুক্ল দ্বিতীয়ার শশধরের মত বালকের কোমলাঙ্গের তটে তটে স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়ের গৌরবব্যঞ্জক ভাব, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া—অম্লানবদনে মলিন ভাবের ক্ষীণ ছায়া? পথিক! দেখিতেছ না, সংসারের অনন্ত চরিত্রের অনন্ত ভঙ্গিমা? দেখিতেছ না, সাদার পাশে কালো আর মৃণালের গায়ে কণ্টক? দেখিতেছ না,—নির্দ্দয়তার সংঘর্ষে দয়ার পরাজয়—সুরাসুর-যুদ্ধে ইন্দ্রত্বের অবমাননা আর অমরাবতীর লাঞ্ছনা? অহো! আমিই বা কি ভ্রান্ত! যে জন্মান্ধ, যাহার মুখের বুলি—"আমি অন্ধ," নিজে অন্ধের মত তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি—"দেখিতেছ না!" সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান পদার্থ জ্যোতির সহিত কোনও দিন যাহার সাক্ষাৎ নাই, যে স্বকীয় নয়নমুকুরে অন্য দৃশ্যের প্রতিবিম্ব না লইয়া, চিরদিনই পরের হৃদয়-মুকুরে স্বীয় বিষাদ-প্রতিমার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত করিয়া দিতেছে, আমি তাহারই উপর দর্শন-শক্তির আরোপ করিতেছি! বাস্তবিকই হায় আমি কি অন্ধ!

মানবের শক্তি পরিমিত ভাবেই প্রদত্ত হয়; একটি ইন্দ্রিয়শক্তি বর্জ্জিত হইলে সে শক্তি রূপান্তরিত হইয়া, অপর ইন্দ্রিয়ে দ্বিগুণভাবে কাজ করে। যে অন্ধ, শ্রবণশক্তি তাহার প্রখর; যে অন্ধ, সে বাহ্য দৃশ্য-প্রপঞ্চে প্রবঞ্চিত হইয়া, শ্রুত ও অশ্রুত উভয়বিধ সঙ্গীতে অধিকতর রূপে বিভোর হইয়া থাকে। তাই জিজ্ঞাসা করি, পথিক! শুনিতে পাইতেছ না, বাহ্যজগৎ তোমার কথায়, তোমার গানে, তোমার দশায়, তোমার দর্শনে, তোমার স্বরে কি উত্তর দিতেছে? শুনিতেছ না—তোমার দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি অন্ধ হইয়া, তোমার অন্ধত্বের উল্লেখ করিয়া,

কর্কশকণ্ঠে কত লোকে কত গালিবর্ষণ করিতেছে? শুনিতেছ না, তোমার সারথি-বিহীন দেহ-রথের ইতস্ততঃ-বিভ্রান্ত গতিতে গাত্র-স্পর্শোদ্রিক্ত মানবমণ্ডলী ঘৃণিত ভাষায়, শোণিত-শুকান কথায় কত তিরস্কার করিতেছে? আরও শুনিতেছ না কি, তুমি স্খলিতপদ হইবা-মাত্র, অশ্বচালকের কশাঘাতে তোমার পৃষ্ঠদেশ সুরঞ্জিত দেখিবার প্রত্যাশায় কত উদ্দাম যুবকের আস্য-বিবরে হাস্যরাশির লহরী-লীলা উপস্থিত হইয়াছে? শুনিতেছ না কি, তোমার সংক্ষুব্ধ সঙ্গীত-ধ্বনি তূষ্ণীভূত করিবার জন্য, তোমার দীন ক্ষীণ নরকঙ্কাল অদৃশ্য করিবার জন্য ঘোর ঘর্ঘর-নাদে ধূলিপটল বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে, মদমাৎসর্য্য-ধর্ম্মী ধনসম্পদ গর্ব্বীর ক্রুহাম, ফিটন ইরম্মদ-গতিতে যাতায়াত করিতেছে? আর সর্ব্বোপরি শুনিতেছ না কি, তোমার ঐ কোমল-কঠোর "আমি অন্ধ"—সঙ্গীত দূর-দীর্ঘোন্নত হর্ম্মামালায় প্রতিহত হইয়া, তদভ্যন্তরীণ মানববৃন্দের অন্তরোচ্ছ্বাসের বাহ্যিক প্রতিকৃতিরূপ এক দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি উত্থিত হইতেছে—"আমি অন্ধ"—"আমি অন্ধ।"

অন্ধ! তুমি ত জ্ঞানান্ধ নও; এ প্রতিধ্বনির অর্থ বুঝিতেছ কি? তোমার প্রতিবেশীর এ মর্ম্মোচ্ছ্বাসের মর্ম্ম-ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছ কি? ও শব্দ তোমার কথার প্রতিধ্বনি নহে; ঐ দুই কথায়, তুমি যাহাদের নিকট আজ ভিক্ষুক বেশে সমাগত, তাহাদেরই মনের কথার সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছে। ঐ দুইটি কথা দ্বারা, প্রত্যেক মানব বুঝাইয়া দিতেছে যেন—"পথিক! ভিখারী, তুমি যতই কেন দুরবস্থ হও, দুঃখ-দুর্দ্দশা-দুর্ব্বিপাক-ক্লিষ্ট হও, তোমার ঐ অবস্থার প্রতি আমি অন্ধ। তোমার দীনদশা দেখাইবার জন্য তুমি যতই কেন ছিন্নগ্রন্থি-

পরিহিত হও না, ক্ষুধা-খিন্ন বদন লইয়া যতই কেন চীৎকার কর না, তোমার ও দশা আমি দেখিব না, তোমার ও ভাষা আমি শুনিব না, তুমি অন্ধ হও বা না হও, তোমার বেলায় আমি যে অন্ধ, সেটি নিশ্চিত। দেখিতে হয়, শিখরি-দশনা ষোড়শীর অনবদ্য বদন-চন্দ্রমা দেখিব, তোমার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুখমণ্ডলের অস্থি সংবর্দ্ধন দেখিব কেন? মুছাইতে হয়, বিলাস-কটাক্ষ প্রত্যাশায় অভিমানিনীর বিরল অশ্রুধারা মুছাইব, তোমার কটাক্ষ-বিহীন চিরনিমীলিত নয়নের রক্তোকলঙ্কিত অজস্র অশ্রুধারা মুছাইতে গিয়া রুমাল অপবিত্র করিব কেন? খাওয়াইতে হয়, যে খাইতে চাহে না, সাধিতে গেলে নাসিকা কুঞ্চিত করে, সাধিয়া সাধিয়া তাহাকেই যত অর্থ লাগে "দিল্লীকা লাড্ডু" আনিয়া খাওয়াইব, উপাদান-বিহীন উদ্বৃত্ত অন্নে তোমার মত ক্ষুধিত রাক্ষসের উদর-পূর্ত্তি করিতে গিয়া গৃহে তণ্ডুলের খরচ বাড়াইব কেন? পরাইতে হয়, আমার উৎকৃষ্টতর অর্দ্ধেক-রূপিণী পারলারের মেমের নবনীতনিন্দী কোমলাঙ্গে রত্নখচিত বডিস্, সেমিজ পরাইয়া মরাল-মন্থর-গতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে জন্ম সার্থক করিব—তবুও "এক টাকায় তিনখানা কাপড়"—ওয়ালাকে ডাকিয়া তোমার লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য অনর্থক কতকগুলা তাম্রমুদ্রার অসদ্ব্যবহার করিব কেন? সঙ্গীত শুনিতে হয়, কাশ্মীরী বাজাইতে বাজাইতে বামাকণ্ঠে পিলু রাগিণীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে "আনাগণা" দেখিয়া জ্ঞান হারাইয়া বসিব—শুনিতে হয়, দাড়ি নাড়িয়া ভুঁড়ি দুলাইয়া শিশুর হসিত-বদনে অমিয়মাখা "বাবা" বোল শুনিব, তোমার ঐ তাল-মান-বর্জ্জিত রুদ্ধশ্বাস-ভঙ্গ "রজক-রঞ্জন গর্দ্দভবৎ" চীৎকার শুনিয়া কর্ণপটহের সংস্কার ব্যবস্থা করিব কেন?

বারংবার কিছু বলিতে চাহি না—আমার কাজ বেশী, সময় কম, অবসর অসম্ভব, সংক্ষেপে বলিতেছি—ইহাতেই তুমি আমার যথেষ্ট দয়ার পরিচয় পাইবে যে,—তোমার প্রতি "আমি অন্ধ!"

যথার্থই দয়ার পরিচয় বটে! অট্টালিকাশ্রেণীও বুঝি কৃতজ্ঞ কৃতদাসের মত প্রভুদিগের বক্তব্যের প্রতিবিম্ব দ্বারা দয়ার পরিচয় দিতেছে! অন্ধ! ভিখারী! কাঙ্গাল! শুনিলে কি জগতের উক্তি? শুনিতেছ না কি, মানব নামধারী পক্ষবিহীন দ্বিপদ-পশুর গর্ব্বদৃপ্ত উত্তর? তোমার প্রাণের সঙ্গীতের মূল্য কি এই? তোমার ক্রন্দনের ফল কি এই? এই জগৎই কি তোমার আবাসস্থলী! এই নগরীই নাকি পার্থিব স্বর্গ? এই কি স্বর্গের ছবি? এ যদি হয় মানব-কবির কল্পনাঙ্কিত স্বর্গের ছবি—তবে এ স্বর্গ চাহি না। চাহি শত জন্ম ধরিয়া নরকের কীট হইতে, তবুও চাহি না এ হেন স্বর্গ। যাহাদের লইয়া তুমি এত আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন কর, যাহাদিগকে জাতির তালিকাভুক্ত করিয়া সদর্পে সৃষ্টজগতের উপর প্রভুত্ব করিতে যাও সে প্রভুদিগের প্রভুত্ব—সে মানুষের মনুষ্যত্ব কি এই? হৃদয়-বলে নাকি মানব রাজা? এই কি সে মানবিক হৃদয়ের পরিচয়? এ যে নিরেট নিস্পন্দ পাষাণ! "জল দাও" "জল দাও" রবে চীৎকার করিলে, পাষাণও নাকি গলে, কিন্তু তোমার সামান্য তৃষ্ণার সামান্য বারিবিন্দুও যে এ পাষাণ-হৃদয়ে নাই। পাষাণে শরীর শীতল করে; এ পাষাণ সংস্পর্শে যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধে ধমনী-শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। পাষাণেই নদীর উদ্ভব, লক্ষ জীবকে স্বর্গের লক্ষ্য দেখাইবার জন্য জাহ্নবী বহমানা। এতদিন যাহা বুঝিয়াছ, তাহা ভুল। সূর্য্য স্থির ছিল, বুঝিয়াছিলে, আজ শুনিতেছ সূর্য্যও ঘূর্ণ্যমান। পাষাণ গলে না

বুঝিয়া রাখিয়াছ—আজ্ চল, হরিদ্বারে চল, হিমাচলে চল, এ সৌধসোহাগ-সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া কমনীয় কাশ্মীরকন্দরে চল, দেখাইব পাষাণ-হৃদয়ই গলে, পাষাণতলেই শান্তিসুখ মিলে;—মানব-হৃদয় গলে না—মানব-মতি টলে না—মানব-রাজ্য শাসিত হয়, শুধু ছলে আর বলে।

কই পথিক! আমার কথায় কি উত্তরও দিবে না? এত ডাকিলাম, এত সাধিলাম, নিজের বুদ্ধিহীনতা লইয়া এত বুঝাইতে গেলাম,—সে কি শুধু অরণ্য ক্রন্দনেই পর্য্যবসিত হইল? শুনিতেই পাইতেছ না কি, অহো! নিজে গাহিতেছ "আমি অন্ধ"—এই "অন্ধ, অন্ধ" রবে তোমার কর্ণরন্ধ্রও কি বন্ধ হইয়া গিয়াছে? এ কি! তোমার ঐ ধনশালী প্রতিবেশীর হৃদয়ের মত, তোমার চরণও যে আর চলে না। ঐ যে ঐ নীরদ-বসনা প্রকৃতির গম্ভীর মূর্ত্তি ভীষণ হইতে আরও ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে—দশ দিক্ নিস্তব্ধ; পাখী গাহে না—শাখী নড়ে না। ঐ যে—ঐ যে—ওকি! ঐ যে দশ দিক—শত দিক্ অন্ধকার করিয়া প্রলয় রোষে, ভৈরব-নির্ঘোষে, অবশেষে ভয়ঙ্কর বাত্যা উত্থিত হইল! তবুও—তবুও তুমি ধূলি-পটল-ধবল-তনুতে অচল! ধন্য! একি, শুধু তাহাই নহে—ঐ যে—আবার ঐ যে কড় কড়নাদে অশনি-সম্পাত আর সঙ্গে সঙ্গে তড় তড় স্বনে বৃষ্টিপ্রপাত! অনাবৃত মস্তকে, নগ্ন দেহে, রুগ্ন তনুতে, তবুও তুমি অটল! আর সেই একই রীতিতে সেই একই নীতি—সেই একই প্রীতিতে সেই একই গীতি—"আমি অন্ধ"।

ধন্য! নরকুলবরেণ্য! ধন্য তুমি! তোমার ঐ দৃষ্টিশূন্য নেত্রে যে পুণ্যজ্যোতিঃ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আমি ঘৃণ্য নগণ্য দীনহীন হইয়া তাহা বুঝিব কেমন করিয়া? আমরা পার্থিব জীব, স্রোতের শৈবাল, দু'দিনের

জীবন লইয়া গর্ব্বে আত্মহারা; মায়ার ছায়াতলে লুক্কায়িত থাকিয়া, মোহ-মকরন্দে অন্ধীভূত হইয়া—আমরা—দেখি শত, বুঝি না এক—ধরাতলে সবাই দেখি চঞ্চল, বেগবান, খরবেগে বহমান; দেখি, অতীতের দিকে সবারই টান—নাহি কিছুই বর্ত্তমান; দেখি, চিত্রের পর চিত্র, পটের পর পট,—আলোর পাশে ছায়া, ছায়ার পাশে ভূত আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়; দেখি, রাজেন্দ্র-প্রাসাদে মৃগেন্দ্র দরবার আর মরুভূমিতে সরোবর; দেখি, দস্যু-দুর্ব্বৃত্তের ভোগৈশ্বর্য্যের পারাবার, আর ধনৈশ্বর্য্যের ছারেখার; দেখি মায়ের চোখে জল, আর প্রিয়ার মুখে হাসির ঢল; দেখি, প্রেমের কোলে হাসির খেলা, আর শ্মশানতটে শমন-লীলা; তাই দেখি, পলকে দেবলোক আর ভূর্লোকে নরক। আমাদের চর্ম্মচক্ষুর কর্ম্মকাণ্ড এই পর্য্যন্ত। আমরা কথায় কথায় জ্বলি, স্ফুলিঙ্গে অগ্নিশর্ম্মা হই, তাই শান্তির স্থানে আনি অশান্তি, সত্যযুগে আনি কলি। সামীপ্য ও সাযুজ্যে প্রকৃতি-দেবীও আমাদের মত চঞ্চলা প্রকৃতি পাইয়াছেন। তাই এই মুহূর্ত্তে যেখানে ছিল সৌরকর-লীলা, পর মুহূর্ত্তে সেই স্থানেই দেখি বিজলির খেলা; এক মুহূর্ত্তে মলয়, পর মুহূর্ত্তে প্রলয়। আমাদের সংসার-নিলয় নিত্যই শুধু অনিত্য ভবের ভেল্কিতে দোলায়মান। তুমি ইহার কিছুই দেখ না, কিছুই বুঝ না, কিছুরই ধারও ধার না—সাক্ষী তোমার ঐ ধীর স্থির মূর্ত্তি আর এই বাত্যা-বিভ্রাটের মধ্যেও নির্ব্বাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ ঐ তনু।

তুমি অন্ধ নও—অন্ধ আমরা; আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; আকাশ-কুসুম দেখিয়া প্রথমে সৌন্দর্য্যে অন্ধ হই, শেষে মধুর লোভে লোভান্ধ হই; বসন্ত-হিল্লোলে, কোকিল কুহরিলে, যৌবনসংস্পর্শে রূপ-কল্পনামাত্র

কামান্ধ; একটি রৌপ্য মুদ্রার অধিকারেই মদান্ধ;—কৌতুক-কুহকে সর্ব্বদাই মোহান্ধ; দানব-প্রকৃতি লইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে গিয়াই জন্মান্ধ; অন্ধ আমরা পদে পদে। চক্ষু মুদিয়া তুমি ও আমি দৃশ্যে এক হই; কিন্তু তুমি ভাব অন্ধকারের মধ্যে যাহা জ্যোতিঃ—আমি ভাবি জ্যোতির মধ্যে যাহা অন্ধকার। সংসার-তাণ্ডবের দর্শকশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া,আমরা কত নীচ ও ঘৃণিত চিত্র ও চিন্তা লইয়া চক্ষু নিমীলিত করি, জাগিয়া ঘুমাইয়া সেই চিত্রের শুধু পটপরিবর্ত্তন করি—স্বপ্ন দেখিও তাহাই। তুমি বাহির দেখ নাই, মোহ-মদিরার পথবর্ত্তী হও নাই; তোমার চিত্র অন্তরের চিত্র—স্বভাব-ভাবের চিত্র। সে চিত্র সততই তোমার নয়নপথবর্ত্তী—নিত্যই তুমি তাহার দর্শক। তাই তুমি অন্ধ হইয়া অন্ধত্বের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছ। তুমি দেখিতেছ—স্পষ্ট-ভাবেই দেখিতেছ—এবং দেখিতেছ, যাহা সত্য, সনাতন, স্বতঃই সুন্দর। তুমি দেখিতেছ, জগৎ অসার, শরীর নশ্বর, আত্মা অমর, মোক্ষই মানবের লক্ষ্য। তুমি দেখিতেছ, পঞ্চভূতে সর্ব্বভূত সৃষ্ট, যখন আত্মা পাখী পলায়, তখন মাটীর দেহ মাটীতে মিলায়। মানবাত্মা পরমাত্মা হইতে আসিয়াছে, মানব-দেহে পরমাত্মার সঙ্গে বাস করে, তবুও তাহার সাধ মিটেনা, ছুটিয়া গিয়া আবার সেই অনন্ত, অব্যক্ত পরমাত্মায় মিশিতে চায়—নির্ব্বাণ চায়। এজগতে আসিয়া মৃণ্ময় দেহে বাস করিতে করিতে, সে লক্ষ্য ভুলিয়া যায়, বাস্তবিকই অন্ধ হয়, নিজের অন্ধত্বের জ্ঞানেও অন্ধ হয়! যতদিন "আমি অন্ধ" এই তত্ত্বজ্ঞান তাহার মনোমধ্যে উদিত না হয়,ততদিন তাহার নিস্তার নাই,—পথ নাই—আশা নাই। বাঞ্ছাকল্পতরুর পদমূলে পড়িয়া, "আমি অন্ধ" বলিয়া মর্ম্মভেদী

স্বরে আর্ত্তনাদ—না করিলে আশা মিটে না—সুফল মিলে না—তাঁহার করুণা-কণার অধিকারী হওয়া যায় না। এতক্ষণে বুঝিলাম, তোমার ঐ "আমি অন্ধ" গীতির অর্থ। তাই পথিক! তুমি পথভ্রান্ত মানবকে পথ দেখাইবার জন্য, অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্নকে শিক্ষা দিবার জন্য—তুমি পথ-প্রদর্শক—তুমি লোকশিক্ষক, বাহ্য জগতের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, একমনে গাহিতেছ, আর যেন ডাকিয়া বলিতেছ—হে প্রেমোন্মত্ত, ধনোন্মত্ত, মোহমদমত্ত, শতভাবের শত প্রকার মত্ত—যে যেখানে আছ, একবার চাহিয়া দেখ, আর কতদিন ভুলিয়া থাকিবে, যদি উদ্ধার পাইতে চাও, তবে একবার চাহিয়া দেখ, আর পরক্ষণে নয়ন নিমীলিত করিয়া ভীতি-ভক্তিবিভোর ভৈরবকণ্ঠে গাও—"আমি অন্ধ"—"আমি অন্ধ"—"আমি অন্ধ"—"আমি——



চোক গেল।

বসন্তের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে; প্রকৃতিরাণী পত্রপুষ্পের বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়াছেন। ফলভারাবনত সহকার, পত্রপ্রাচুর্য্যগর্ব্বিত অশ্বথ এবং কুসুমামোদমত্ত চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষের পল্লববিতান হইতে হর্ষোৎফুল্ল বিহগকুলের কল-কোলাহলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইতেছে। চারি দিকে শুধু হরিদ্বর্ণের একাধিপত্য,—সৌন্দর্য্যের হাট। সৌন্দর্য্যের মধ্যে মাধুর্য্যের লীলা; তাহারই সহিত অপূর্ব্ব মিলনে প্রকৃতির অন্তর-রাজ্যের এক অস্ফুট সঙ্গীততান মিশিয়া রহিয়াছে। সেই সঙ্গীতের স্বর-লহরী ভেদ করিয়া সহসা ঐ কে উধাও কণ্ঠে গাহিল—"চোক গেল," "চোক গেল"——

লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া এক কুক্রিয়াসক্ত মানব স্বকীয় চরিত্র হইতে মনুষ্যত্বের চিহ্নগুলি সযত্নে মুছিয়া ফেলিতেছিল; সে আপন অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের এক মানচিত্র অঙ্কন করিয়া, নানা আশার উৎসাহে, চিন্তার প্রবাহে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় তাহার উপর অঙ্কপাত করিতেছিল। তাহার কঠোর হস্তের কর্কশ রেখাপাতে কত অনাথার হৃৎপঞ্জর ধ্বসিয়া গেল; কত দুর্ব্বলের জীবনতারা খসিয়া পড়িল, কত অবলার সতীত্ব-সম্পদ দলিত হইল। এমন সময়ে আকস্মিক তীব্রস্বরে কে ঐ গাছের আড়াল হইতে গাহিল—"চোক গেল," "চোক গেল"——

দুর্ব্বৃত্ত ভাবিল, এ কে? এ কি মানব? আমি ত মানবের গন্তব্য পথ সুকৌশলে পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছি! তবে এ কে? আমার কার্য্যপ্রণালী মন্ত্রণাবলী দেখিয়া, কাহার চোক গেল? ভগবান ভিন্ন

এ ভুবনে এ দৃশ্য কাহার নিকট এত অপ্রীতিকর ? হৃদয় কাঁপিল; চঞ্চলচিত্তে অভাগা চারি দিকে চাহিল, আবার দিগন্ত কাঁপাইয়া সেই একই স্বর-লহরী—"চোক গেল," "চোক গেল"——

রাষ্ট্র-বিজয়ী সেনাপতি অরাতি-সম্পদ লোষ্ট্রমূল্যে ক্রয় করিয়াছে; শত্রু-শোণিত সলিলবৎ আদায় করিয়াছে; এক্ষণে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের পর শফরী-প্রত্যাশী ধীবরের মত প্রজার অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ সমূলে সংগ্রহ করিবার জন্য ঘন-গ্রন্থিত শুল্কজাল পাতিয়া বসিয়া, আকাঙ্ক্ষার দূরবীক্ষণে দূর-গৃহবাসে সৌধকেতন অবলোকন করিতেছে। এমন সময়ে কে ঊর্দ্ধতন শ্বেতাম্বরে আপন কায়া লুকাইয়া ভীতিপ্রদ-স্বরে গাহিল—"চোক গেল"—"চোক গেল"——

সেনাপতি ভাবিল, আজ দেশ দেশান্তরের সমস্ত চক্ষু আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না; এমন সময়ে আমার গৌরব-মণ্ডিত অবদান-পরম্পরা সন্দর্শন করিয়া কে গাহিতেছে—"চোক গেল ?" আমি শত্রুর দেশে অজস্র অশ্রুর ধারা বহাইয়া দিয়া যাহাদের নেত্রপদ্ম অন্ধীভূত করিয়া দিয়াছি, এ কি তাহাদেরই ক্রন্দনধ্বনি ? না, তাহারা আমার সমক্ষে কাঁদিতেও সাহস করে নাই। এ যে কেমন নির্ভীক কণ্ঠে অকুণ্ঠিতভাবে বৈকুণ্ঠের পথ হইতে গাহিতেছে—"চোক গেল।" পৃথ্বীপৃষ্ঠের বহু অঞ্চল ধ্বংসেও যাহার রোমাঞ্চ হয় নাই, আজ তাহার শরীর শিহরিল, হৃদয় কাঁপিল। সঙ্কুচিত ভাবে, চিন্ত-খিন্ন সেনানী শুনিল, সেই একই গীতি, সেই একই অপূর্ব্ব লহরী—"চোক গেল, "চোক গেল"——

বাস্তবিকই অপূর্ব্ব ধ্বনি। কত পশুর চীৎকার, মানুষের কোলাহল,

পাখীর কলরব—সকল রব অতিক্রম করিয়া, সকলস্তর ভেদ করিয়া, সঞ্চিত সংশিষ্ট বাষ্পের মত মুক্তিমাত্র অম্বরমুখী হইয়া, ক্রমোন্নত তানে শব্দ হইল—“চোক গেল—গেল—গেল।” পরদ্রব্যে যে লোলুপ নেত্রে চাহিয়াছিল, তাহাকে চমকাইয়া বলিল; পরদারে যে কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহাকে শাসাইয়া বলিল; যাহার অনর্থক রোষ-কষায়িত নেত্র হইতে অগ্নিকণা বর্ষিত হইতেছিল, তাহাকে ভর্ৎসিয়া বলিল;—বলিল সকলকে সেই একই কথা—শুনাইল সকলকে সেই ভীতির গাথা—সেই সর্ব্বজন-বোধগম্য ভীষণ ভাষা—“চোক গেল” “চোক গেল”—চোক গেলে আর থাকে কি? শারীরিক প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোকের যত প্রয়োজন, চোকের প্রতি যত আদর, চোকের জন্য যত ভয়, এত আর কিছুরই বেলায় নহে। বায়ুপ্রবাহে, মক্ষিকার সন্তাড়নে, বালুকণার উল্লম্ফনে ক্ষণে ক্ষণে ‘চোক গেল’ বলিয়াই ভ্রম হয়। তুমিও কি কলি-কলুষ-প্রবাহে পৈতৃক চক্ষুর জন্য অকারণ অসংযত ভাবে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছ? চোকে কোন আঘাতের আশঙ্কা হইলে লোকে আগে অজ্ঞাতসারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরে কারণ জানিবার জন্য ব্যস্ত হয়। তোমার রব শুনিয়াও তেমনি চোক যাউক বা না যাউক সকলেই প্রথমে বিস্মিত, ভীত হইয়া পরে চক্ষু মুদিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—তুমি কে?

তুমি কি দেবতা? শূন্য হইতে যে অলৌকিক সঙ্গীত-নিঃস্রাবে বিশ্ব-জগৎ পরিপ্লাবিত করিয়া দিতেছ, দেবযান হইতে যে দৈববাণী দ্বারা মর্ত্ত্য-হৃদয় চমকিত করিয়া তুলিতেছ, তাহা দেবতার ভিন্ন অন্যের সম্ভবে না সত্য; কিন্তু বিশ্ব-দৃশ্যের দর্শক হইয়া যে তীব্র কটাক্ষ, রূক্ষ গর্ব্ব ও কঠোর বিদ্রূপের ভঙ্গি তোমার ঐ সঙ্গীতের মর্ম্মে নিহিত করিয়া রাখিয়াছ,

দেব-প্রকৃতিতে তাহা সম্ভবে না। তবে কি তুমি মানব? মানব ত সমাজ যন্ত্রের প্রত্যঙ্গীভূত। মানবের দোষ, মানবের গুণ, মানবের পাপ, মানবের পুণ্য, কিছুই সে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যাহাকে সংসারে থাকিয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া, মিলিয়া মিশিয়া, ভাসিয়া ডুবিয়া, সকলের সঙ্গে একত্র চলিতে হয়, সে কিন্তু অন্য হইতে ক্ষণকালের জন্য পৃথক্ হইয়া, একটু উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া সমগ্র সমাজের উপর উদগ্র-ভাবে কঠোর কটাক্ষপাত করিতে পারে না।

তবে কি তুমি পাখী? পাখী যদি হও, তবে যে বসন্তে পল্লবান্তরণে পঞ্চমতানে প্রাণ খুলিয়া মন মাতাইয়া কুহুরব করিতে করিতে, কবির লেখনী মুখে প্রেমিকের প্রণয়োচ্ছ্বাসে এবং বিরহীর মর্ম্ম গাথায় এক অপূর্ব্ব উদাস ভাব জাগাইয়া দেয়, তুমি সে বসন্তের প্রিয় পাখী কোকিল নহ। আবার যে যখন তখন, সকালে বিকালে, সরসীকূলে বা অন্দর-বৃক্ষে অকুতোভয়ে কুলবধূর সহিত রহস্য করিতে গিয়া—"বউ কথা কও" রবে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে হাস্য-লহরী ছুটাইয়া দেয়, তুমি সে পাখীও নহ। প্রাচী-দ্বারে রক্তারুণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিবার প্রাক্কালে যে পাখী বীণাবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠের ললিত ঝঙ্কারে ভগবদ্-প্রেমের মহিমায় সমস্ত বিশ্বকে জাগাইয়া তুলে, তুমি সে শ্যামাও নহ। তবে তুমি নিশ্চয়ই সেই পাখী—যাহার প্রসঙ্গশূন্য হইলে উপন্যাস অসম্পূর্ণ হয়, প্রেমকাব্য অঙ্গহীন হয়, নিসর্গ-নিকুঞ্জের ঐক্যতানের স্বরগ্রাম একটি পরদাহীন হইয়া পড়ে, তুমি সেই প্রাণোন্মাদকারী পাপিয়া। তুমি পাপিয়া বটে, কিন্তু পাপী নহ। কারণ, পাপীর কণ্ঠ এমন অকুণ্ঠিত অথচ মর্ম্মগ্রাহী, এমন সগর্ব্ব অথচ সকরুণ হয় না। হাঁ, বুঝিয়াছি;

পাপের সহিত তোমার সম্পর্ক নাই; তুমি পা-পিয়া পাপিয়া হইয়াছ; মহামহিমময়ী মায়ের পদ্মামৃত পান করিয়া, পানারুণ-নেত্রে অন্যের পাপাতঙ্ক সঞ্চার করিয়া দিয়া, বায়ুস্তর ভেদ করিয়া সুধা বর্ষণ করিতে করিতে, আপন মনে আপনি বিভোর হইয়া, শুধুই কেবল গাহিতেছ—"চোক গেল"—"চোক গেল।"——

তুমি কেন চীৎকার কর পাখি? তোমার কিসের অভাব? তরু-লতায় ফল আছে, নদ নদীতে জল আছে, ডালে ডালে বিশ্রাম করিতে পার, অনন্ত আকাশে স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পার, তোমার আবার অভাব কি? আমাদের মত তোমাকে অন্নকষ্টে, জলদুর্ভিক্ষে, রাজনিগ্রহে, প্রজাবিদ্রোহে, ধর্ম্মের পাশে, সমাজের শাসনে, মহাজনের অত্যাচারে, দুর্জ্জনের ব্যবহারে সর্ব্বদা সমভাবে জর্জ্জরিত হইতে হয় না। তুমি প্রকৃতির উন্মুক্ত রাজ্যে স্বচ্ছন্দভাবে যথেচ্ছবিহারে বাস কর বলিয়া, তোমার অভাব বা অত্যাচার-জনিত দুঃখে কাতর হইবার কোন কারণ নাই। তবে তুমি কাঁদিতেছ কেন? একি যথার্থই তোমার ক্রন্দন? ক্রন্দনে কি স্বরোচ্ছ্বাসের ক্রমোন্নতি থাকে? পরদার পর পরদা চড়াইয়া কোকিল পঞ্চমে থামে, তুমি যে সপ্তমে না গিয়া নিরস্ত হও না! এমন নিয়মিত অভিনয়-সম্মত ক্রন্দন ত কখনও শুনি নাই।

তুমি ক্রন্দন করিতেছ, তাহা সত্য। তোমার ভাষা হইতে আশঙ্কা হয়, যেন তুমি চক্ষুরোগগ্রস্ত। কিন্তু চক্ষুরোগাক্রান্ত প্রাণী কি এমন কৌশলে পরের চোকের অন্তরালে বসিয়া পরের অজ্ঞাতসারে পরের প্রাণে এমন আঘাত করিতে পারে? শিশুকাল হইতে তোমার রব শুনিয়া আসিতেছি; শুনিবামাত্র অন্যমনা বা অন্যথাবৃত্তি হইয়া পড়ি; তোমাকে

দেখিবার জন্ত আপন মনে, বনে জঙ্গলে পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু কখনও দেখি দেখি, অথচ দেখি নাই; কখনও বা দেখিবামাত্র হারাইয়াছি। কিন্তু এখনও তোমার আকৃতির একটা প্রকৃষ্ট ধারণা করিয়া রাখিতে পারি নাই। এখনও বলিতে পারি না, তুমি কেমন পাখী। তবুও তোমাকে চিনি; বুঝি, তুমি চক্ষু রোগগ্রস্ত নহ, বরং অতিরিক্ত চক্ষুষ্মান্। যাহারা নিজেরা অন্ধ, তাহারাই অন্তকে অন্ধ দেখে, স্পষ্টই বুঝিতেছি, আমরাই অন্ধ, আমাদেরই চোক গিয়াছে। তুমি আমাদেরই অবস্থা অভিব্যক্ত করিয়া মর্ম্মান্তিক ভাষায় দিগন্ত মাতাইয়া চীৎকার ধ্বনি উঠাইতেছ—"(তোমাদের) চোক গেল—চোক গেল—গেল—গেল"—

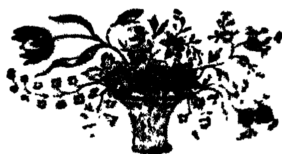
তুমি সত্যযুগের পাখী। সত্যই তোমার সাধনা। যুগের পর যুগ গিয়াছে; সত্যাপলাপের কত প্রকার ভঙ্গিমা, কত প্রকার ছলনা দেখিয়া আসিতেছ; কিন্তু তাহাতে তোমাকে টলাইতে পারে নাই। প্রবল সত্যের অভিব্যক্তি করা যখনই তোমার ধর্ম্মানুগত বলিয়া বোধ করিয়াছ, তখনই প্রশংসা বা তিরস্কারের সময়োচিত ভাষায় লোক সমাজকে উত্তিক্ত করিয়া তুলিয়াছ। ধর্ম্মই যখন চরম সাধনা ছিল, সত্য পথানুবর্ত্তী মানবের প্রতিকথাই তখন ছিল—"চোক জুড়ান"—"চোক জুড়াল।" তখন তোমার সেই দৈববাণীতুল্য উৎসাহ বর্দ্ধক মধুর গাথায় ধর্ম্মের উচ্চআদর্শ দেশ-বিদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত, পাষাণী মানব হইত, তরু তরু মুঞ্জরিত, যমুনা উজান বহিত। সে এক দিন ছিল। আজ আর সে দিন নাই; তাই তুমিও বুলি বদলাইয়াছ। তোমার প্রশংসার বাক্য এখন তীব্র কটাক্ষে পরিণত হইয়াছে। কলির বৃত্তনিচয় নিশ্চয়ই তোমার

নিকট অপরাধ বলিয়া বোধ হয়। তুমি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পার না। সবলে দুর্বলের অন্ন কাড়িয়া খাইলে, অনধিকারী অযথা প্রতিপত্তি স্থাপন করিলে, সভ্যতা-দৃপ্ত মানব হইয়া কার্য্যতঃ রক্তপিপাসু পশু হইলে, তুমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া চীৎকার কর "চোক গেল।" রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, শাসক যদি নাশক হয়, বিচারপতি যদি পক্ষপাতী হয়, অমনি তোমার চোক যায়। এখন সৌন্দর্য্যের খাতিরে মাতৃস্তন্য শুকাইয়া যায়; দাসী পুত্রের কণ্ঠ শুষ্ক করিয়া, সেই স্তন্যে ধনীর সন্তানের অঙ্গ পুষ্টি করে। গোবৎসের ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া কুকুরশাবককে দুগ্ধপান করান হয়। পিতার ভূলোক হইতে অপসারিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া শ্যালকের কপালে রাজ-তিলক পরাইয়া দেওয়া হয়। সতী দয়িতার হস্তের কঙ্কণ লইয়া বারবনিতার অলঙ্কারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এ সব ভীষণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চোক গেল না কাহার? যে লক্ষ্মীর বরপুত্রের সৌধ-নিকেতনে সুন্দরী নর্ত্তকীর সঙ্গীতবাদ্য নৃত্যোচ্ছ্বাসে গৃহাঙ্গণ প্রকম্পিত হইতেছে, তাহারই একখানি মাত্র ইষ্টক প্রাচীরের অন্তরালে এক অনাথিনী কয়েকটি অভুক্ত অপগণ্ড শিশু সন্তান লইয়া ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে। এ দৃশ্য কি দেখা যায়? না, মনে মনে চিন্তাও করা যায়? নর্ত্তকীর মদিরকণ্ঠ থামিতে থামিতে প্রভাত হইতে না হইতে তুমি গাহিয়া উঠিলে—"চোক গেল"। তখন সকলে মোহমদিরায় ঘুমের ঘোরে অচেতন; তোমার তীব্র তিরস্কারে কাহার চৈতন্য হইবে? আজ হিন্দুর সন্তান ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভার সংসার-ত্যক্তা দূরসম্পর্কীয়া বৃদ্ধা দিদীমাতার উপর দিয়া এবং রন্ধনশালার ভার নিরুদ্বেগে বৃত্তিপালিতা পাচিকার উপর দিয়া, সর্ব্বদা সুসজ্জিতা গৃহিণীকে

শয়নাগারের বিশ্রম্ভালাপ ও তাম্বুল-রচনা রূপ গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া আদর্শ গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতাদান করেন। মল্লিকার মালায় ও চম্পকের স্তবকে যখন বাবুদের খানার টেবিলের শোভা বর্দ্ধন করে, তখন অদূরবর্ত্তী চর্ম্মচটিকাপূর্ণ ভগ্নমন্দিরস্থ 'সেকেলে' শিবলিঙ্গকে তাহারই গন্ধ গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট থাকিতে হয়। এখন সস্তুত হইয়া পূর্ণগ্রাসে প্রাতরাশ চালাইতে চালাইতে বৈদান্তিক মীমাংসা হয়; বাবুর্চ্চি মহাশয়ের মধ্যাহ্ন রন্ধনের চাতুর্য্য চর্চ্চা করিতে করিতে, সমাজের বহু সমস্যা সম্বন্ধে প্রস্তাব মালা উথাপিত, আন্দোলিত ও সমর্থিত হইয়া যায়। সান্ধ্যভোজে অর্থের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে, সেই সভায় পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধের অকর্ত্তব্যতা প্রসঙ্গে রঘুনন্দন ভায়ার মূর্খতার একটা "বিদুষাম্পরা-মর্শ" স্থির করিয়া রাখা হয়। সে সান্ধ্যভোজের আমোদ প্রমোদে নিশা শেষ হইতে না হইতে তুমি বকুল ডাল হইতে কর্কশ কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠ—"চোক গেল"—"চোক গেল"—

বর্ত্তমান যুগের দুর্দ্দশার কত বলিব পাখি! তুমি ত চোক দিয়া সকলই দেখিতেছ। ধর্ম্ম এখন বিলাসের ভয়ে সহর হইতে বনে গিয়াছে; পুষ্প এখন বিলাসের জন্য বন হইতে সহরে আসিতেছে। কর্ম্ম এখন হৃদয় হইতে মুখে আসিয়াছে; ভালবাসা এক্ষণে ভাষার তরঙ্গে ভাসমান হইতেছে। এখন লোকে যাহা ভাবে, তাহা করে না; যাহা করে, তাহা ভাবে না। মৎস্য মাংস-ভোজী বিবাহিত যুবকগণ এক্ষণে শুক্ল-রেশী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন; অশিক্ষিত পুরোহিতের ব্যাকরণ-চর্ব্বণকারিণী পরস্মৈপদী ভাষায় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মুণ্ডপাত করা হয়। বর্ত্তমান অদ্ভুত যুগে পুত্রত্ব পরিচয়ের বেলায়, বন্ধুত্ব কথার ছলে এবং

সতীত্ব পত্রের ছত্রে প্রকাশিত হয়। আজকাল স্বার্থ দ্বারা আর্ত্ত, বিদ্যার দ্বারা কুলীন এবং পল্লবগ্রাহিতা দ্বারা বিদ্বান চিনিতে পারা যায়। এখন আর বৈষ্ণব নাই, আছে শুধু তিলক আর ফোটা; শাক্ত নাই, আছে শুধু মদ্যপানের ঘটা; ব্রাহ্ম নাই, আছে শুধু চশমার ছটা। আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই, শক্তি মতি নাই,—আছে শুধু "আমির" ছড়াছড়ি। কর্ত্তায় 'আমি', কর্ম্মে 'আমি', ক্রিয়ায় 'আমি'। কার্য্য হইলে বলি, করি আমি—ব্যবহারে প্রকাশ পায় ভণ্ডামি—প্রকৃতপক্ষে সপ্রমাণ হয় পাগলামি। আমি ও আমিত্ব লইয়াই আমরা ব্যতিব্যস্ত ও আত্মহারা। তাই আমরা তোমার চক্ষুঃশূল। তুমি বিশ্বপতির নিয়োজিত কঠোর সমালোচক। তুমি চিরদিনই সঙ্ঘ, সমিতি বা সমাজ হইতে উচ্চে থাকিয়া, বর্ণ ধর্ম্ম বা জাতীয়তার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ধনসম্পদ বা বিদ্যার গর্ব্বভঙ্গির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া—তীব্রকণ্ঠে, ব্যগ্রভাবে, উগ্রভাষায় সকলকেই সমান ভাবে শুনাইয়া দিবে—শুনাইবে যাহা সার, যাহা সত্য, যাহা সনাতন, ইঙ্গিতে বুঝাইবে যাহা সদসৎ নির্ণয়ের উপায়, ইঙ্গিতে দেখাইবে যাহা কর্ত্তব্যের পন্থা।



স্বপ্নের মোকদ্দমা।

[অমরনাথের পথে এক ভৈরবীর উক্তি]

গুরুদেব !

ভবদীয় চরণে এ দাসী অপরাধিনী কিসে? কিসে আজ আমি আপনার বিরাগভাজন হইলাম? ক্রোধ-কষায়িত রক্তিম নয়নের এ হেন ভ্রূকুটিভঙ্গি কেন? নারীজাতি বলিয়াই কি এত ঘৃণা? এ দীনা, রমণী বলিয়াই কি এত ঘৃণ্য? শুনিয়াছি কামিনী-কাঞ্চনে সন্ন্যাসী মাত্রেরই অভক্তি। আপনি মহাতপা সন্ন্যাসী, আপনার দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুজাল-সমাবৃত প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল প্রবীণত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু দূর স্মৃতিপটে প্রকটিত হয় না কি গুরুদেব! সেই হাস্যপরিহাসময় বহু পুরাতন অথচ নিত্য-নূতন শৈশবের কথা? মনে পড়ে না কি গুরুদেব! যে দিন আমারই মত রমণীর কোলে অঙ্গ আস্ফালন করিয়া আমারই মত রমণীর যত্নে পরিবর্দ্ধিত হইতেন? যে দিন আমারই মত রমণীর কটাক্ষপাতে হাসিয়া হাসিয়া আত্মহারা হইয়া, আমারই মত রমণীর কণ্ঠালিঙ্গনে পূর্ণানন্দে পাগলপারা হইয়া, আমারই মত রমণী-হৃদয়ে নিদ্রাবিষ্ট হইয়া কাল কাটাইতেন? যে দিন জননীরূপে রমণী শরীর-পোষিকা, হৃদয়-তোষিকা এবং সংসারের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের আশ্রয়ভূতা, যাবতীয় সুখের নিদানস্বরূপা এবং মানব জীবনের সর্ব্বস্ব ধন ছিল, সে দিনের কথা, সে শৈশব-সোহাগের দিনের কথা মনে পড়ে কি? সে দিন রমণীর প্রতি ঘৃণা ছিল কি? ঘৃণা থাকিলে জীবন বাঁচিত কি? এ সন্ন্যাস-ধর্ম্মে স্ব পথ প্রসারিত হইত কি? যে প্রবৃত্তির

বলে আজ্ জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছেন, কোন্ হৃদয়-কন্দর হইতে সে প্রবৃত্তি-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল? মনে পড়ে কি? অকৃতজ্ঞ, তাই রমণীজাতিকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছ। রমণী ত কখন পুরুষকে ঘৃণা করে না। যা'ক্ সে কথায় কাজ নাই; রমণী হইয়া আমি এত দূরে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আপনার বিরক্তির কোন কাজ করিতে আসি নাই। তবে জানেন কি গুরুদেব! আসিয়াছি কেন?

আমি আপনার শিষ্যের ধর্ম্মহানি করিতে আসি নাই। আমি তো আপনার শিষ্যের সদনুষ্ঠানের পথে, কর্ত্তব্যের পথে কণ্টক হইতে আসি নাই। আমি তো আপনার শিষ্যের মতিগতির বিরুদ্ধাচার করিতে আসি নাই, চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে বা পাপ-প্রলোভনের প্রসার করিতে আসি নাই। এক দিন ঐ প্রেমময়ের হৃদয়ের উপর আমার স্বত্ব ছিল, ঐ করুণাময়ের করুণা-কণার উপর আমার অধিকার ছিল, এক দিন ঐ শান্তিময়ের শান্তরসাস্পদ হৃদয়োপবনের এক প্রান্তে আমি অধিষ্ঠাত্রী ছিলাম। কিন্তু সে একদিন গিয়াছে; দিন যায় বই থাকে না; আর গিয়াছে তো সে ভালই গিয়াছে! আজ্ আমি সে স্বত্ব ফলাইতে আসি নাই, সে অধিকার দেখাইতে আসি নাই, আপনার দরবারে স্বত্বের মোকদ্দমা করিতে আসি নাই। তবে বলিতে পারেন কি গুরুদেব! আমি আসিয়াছি কেন?

কোথায় চট্টগ্রাম আর কোথায় এই চন্দনবাটী! কোথায় সেই বঙ্গোপসাগরের চলোর্ম্মি-প্রহত, শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন-কান্তার-পরিমণ্ডিত ভারতের দক্ষিণ-সীমাবস্থিত দারুণ প্রদেশ, আর কোথায় এই হিমরাশি পরিবেষ্টিত, হিমাচলের গহ্বরস্থ, অমর গঙ্গার কল কল ধ্বনি-বিধুনিত

অমরনাথের পথে এই দারুণ আশ্রম! বলিতে পারেন কি গুরুদেব! এত বিপদ অতিক্রম করিয়া এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া, এ দূর দেশে আমি আসিয়াছি কেন? বলিতে পারেন কি গুরুদেব! এমন অজানা অচেনা দেশে, এমন দীনহীনা বেশে, নারী হইয়া অভাগিনী এমন নিরাশ্রয়ে শেষে আসিয়াছি কেন? ঐ যে সম্মুখভাগে, ঐ যে পশ্চাৎ-ভাগে, ঐ ঐ ঐ ঐ, ঐ যে চতুর্দ্দিকে অনন্ত অসীম রজত-ধবল তুষারমালা পরিলক্ষিত হইতেছে, উহারই মধ্যে কতদিন নিক্ষিপ্ত হইয়াছি; ঐ যে উচ্চ কথা কহিবামাত্র, হাতের করতালি শব্দ মাত্র, তুষার পর্ব্বত হইতে অপ্রতিহতগতিতে অজস্র স্রোতধারা বহিয়া পড়ে, উহারই প্রবাহে কত দিন ভাসিয়া গিয়াছি, মরিতে পড়িয়াছি, মরিয়াছি বলিয়াও বোধ হইয়াছে, তবুও—তবুও (আপনার শিষ্যের পদানুসরণ করিয়া) অবিরত গতিতে ছুটিয়া ছুটিয়া, বলিতে পারেন কি, এখানে আসিয়াছি কেন? কত কত দিন পথিমধ্যে দারুণ জঠরানলে জর্জ্জরিত হইয়াছি, কত কত দিন দুঃসহ শীতসন্তাড়নে অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়াছি, কত কত দিন প্রবল ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র পাপাবতার দস্যুর হস্তে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অসংখ্য কৌশল যোজনা করিয়া স্বীয় সতীত্ব—নারীর একমাত্র সম্পত্তি পবিত্র সতীত্বরত্ন রক্ষা করিয়াছি। বলিতে পারেন কি, তবুও প্রতিহত না হইয়া, শিথিলপ্রযত্ন না হইয়া, মনের বল না হারাইয়া, দুঃখের পাথারে ভাসিয়া ভাসিয়া—এত কষ্টেও এখানে আসিয়াছি কেন?

আমি ধনীর কন্যা, লক্ষপতির পুত্রবধূ, রাজ্যেশ্বরের হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বরী; তবুও সময়ে উদরে অন্ন নাই, পরিধানে উপযুক্ত বস্ত্র নাই, মস্তকে তৈল নাই। আমি বহুতর আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিতা, অসংখ্য

দাস-দাসী-নিষেবিতা, বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের পূর্ণাধিকারিণী; তবুও আজ আমি দ্বিতীয় সঙ্গি-বিরহিতা, পদব্রজ গমনে আমার একদিনের সেই অলক্তকরাগ-রঞ্জিত কোমল পদতল কণ্টকে কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত, আমার অর্থ-ভাণ্ডার আজ কপর্দ্দকমাত্র পরিশূন্য, তবুও এমন দুরবস্থায় দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া,—এমন দুঃসহ যাতনানলে দগ্ধীভূত হইয়া,—তবুও এমন মনের বলে, এমন হৃদয়ের গর্ব্বে, এ অজানিত অলক্ষিত অলঙ্ঘ্য শৈলমালা-পরিবেষ্টিত প্রদেশে আসিয়াছি কেন? হৃত-সর্ব্বস্ব কৃপণের মত ধনান্বেষণে আসি নাই, আমি অধিকার-প্রমত্ত বিষয়ীর মত স্বত্বানুসন্ধানে আসি নাই, আমি অভিমানিনী রমণীর মত প্রোষিতভর্ত্তার ক্রুটীর জন্য প্রতিশোধ লইবার প্রত্যাশায় আসি নাই, তবুও বলিতে পারেন কি, বারংবার জিজ্ঞাসায় বিরক্ত হইয়াও একবার বলিতে পারেন কি গুরুদেব! আসিয়াছি কেন?

আপনি সন্ন্যাসী, সংসারীর এ মর্ম্ম কাহিনী কি আপনি জানেন? এ প্রেমের রহস্য, এ প্রাণের আকর্ষণ, এ হৃদয়ের আবর্ত্ত—আপনারা ইহার কি বুঝিবেন? আপনারা তো এই সকল আবেগ ও আবর্ত্তের আশঙ্কায়, সংসারের এই প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি, পাপতাপ, জ্বালামলার ভয়ে, গৃহবাস ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সংসারের গ্রন্থি কাটিয়া, ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়িয়া, ভালবাসার বস্তুর প্রতিমাখানি পর্য্যন্ত হৃদয়-ফলক হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, জন মানবের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া—আজ সাধু হইয়াছেন, যোগী হইয়াছেন, সন্ন্যাসী বলিয়া নাম কলাইয়াছেন। কিন্তু বলুন দেখি, যাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া, চির জীবনের মত গিরিগুহায় আশ্রয় লয়, তাহারাই ভাল, না

যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অমিত-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শেষে জয়লাভ করে, অথবা পরাজিত হইয়া শত্রু-কবলে নিপতিত হয়, তাহারা শ্লাঘনীয়? আপনারা ত পলায়নপর ভীরু; এ সংসার ধর্ম্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র; যাঁহারা এ সমর-ক্ষেত্রে বিপদাপদে ব্যাহত না হইয়া, অসীম পরাক্রমে যাবতীয় বিঘ্ন বিপত্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সংসারীর বেশে সাহসী যোদ্ধার ন্যায় এ সংসার-সমরে জয়লাভ করেন, তাঁহারা কি আপনাদের অপেক্ষা শক্তিশালী নহেন, প্রশংসার্হ নহেন? আর শুধু জয়ীদিগের কথাই বা বলি কেন? যাঁহারা এ সমরাঙ্গণে পরাজিত হন, তাঁহারাও কি আপনাদের মত পলায়নপর সংসার-বিরাগী ভীরু অপেক্ষাও উচ্চপদস্থ নহেন? ভীত বলিয়াই তো বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; ঐ পরিচ্ছদের গুণেও এখন অনেক বিপদ আপনাদের নিকটবর্ত্তী হয় না; ঐ পরিচ্ছদের মর্য্যাদায় লোকে বিশ্বাস করে, ভিক্ষুক হইলে, ভিক্ষা মিলে! আপনারা তো ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূলে বিনষ্ট করিয়া, কলে কৌশলে ইন্দ্রিয়ের হাত এড়াইয়া, ইন্দ্রিয়োত্তেজক প্রলোভনরাজি হইতে দূরে রহিয়া, আজ জিতেন্দ্রিয় আখ্যা ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর ইন্দ্রিয় দিয়াছেন কি বিনাশের জন্য? সবাই যদি আপনাদের মত সন্ন্যাসী হইয়া বসিত, তবে সংসার কয়দিন চলিত? সন্ন্যাস মানবের একমাত্র ধর্ম্মপথ নহে, পথের একটী ক্ষুদ্র শাখা মাত্র। গাড়ী, ঘোড়া, হাতীর ভয়ে দুই এক জন এ সঙ্কীর্ণ পথে সরিয়া দাঁড়াইতে পারে বটে, কিন্তু প্রশস্ত রাজবর্ত্ম এ নহে। ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া, কর্ত্তব্য-পালনের বেলায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি অপ্রতিহত রাখিয়া, যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযত করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা কি আপনাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চপদস্থ নহেন? সংসারের

শত কোলাহলের ভয়ে আপনারা নির্জ্জন-পর্ব্বত-কন্দর-সমূহে ঈশ্বর সাধনায় রত আছেন! কিন্তু যাঁহারা প্রাণি-জগতের কল্লোল মধ্যে বাস করিয়া, শতকর্ত্তব্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সহস্র প্রকার কার্য্য সাধিয়া, দিনান্তে একবার মাত্রও ভক্তিভরে ভগবানের ভূমানন্দবর্দ্ধক পবিত্র নামে বিভোর হইতে পারেন, তাঁহারাও কি আপনাদের অপেক্ষা ভক্তের তালিকায় উচ্চ-সংশ্লিষ্ট নহেন?

আপনারা নাকি সর্ব্বদা জপতপঃ এবং কঠোর সাধনা করেন। কিন্তু ঐ যে এক ভীষণ দারিদ্র্যগ্রস্ত সংসারী ব্যক্তির চারিধার ঘেরিয়া সোণার পুত্তলীর মত, আধ প্রস্ফুটিত গোলাপের মত, নাবালক শিশু সন্তানগণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে আর ঘোর আর্ত্তনাদে কর্ণ-বিবর বিদীর্ণ করিতেছে, আর ঐ পর্ণকুটীরের ভগ্নদ্বারের অন্তরাল হইতে এক মলিন-বেশা ছিন্নবাস-পরিহিতা, সৌন্দর্য্য-ললামভূতা অপূর্ব্ব রমণী সেই দৃশ্য দেখিয়া অবিরল নয়ন জলে ভাসিতেছে, আর ঐ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঘোর অঙ্গভঙ্গিতে প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি "মহাজন"গণ দেনার জন্য বারংবার কর্কশ কণ্ঠে বাক্যানল উদ্গীরণ করিয়া মহাজন নামের অবমাননা করিতেছে,— এই ভীষণ দৃশ্যের মধ্যে বসিয়া যে ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিতেছে, আর মাঝে মাঝে ভক্তিভরে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার চরণে হৃদয়ের গাথায় হৃদয়ের ব্যথা জানাইতেছে, সে কি আপনাদের অপেক্ষায় কঠোর সাধনা করিতেছে না? আর ঐ যে একজন স্বীয় নয়নের সম্মুখে প্রাণাধিক পুত্রকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া কাতর হই-তেছে না? আর ঐ যে একজন হৃদয়ের প্রেম, শরীরের প্রাণ, প্রাণের পিপাসা, মানব-জীবনের আশা—সমস্ত আর এক জনকে বিনামূল্যে

বিলাইয়া দিয়া, পরে কর্ত্তব্যের দায়ে তাহাকে স্বহস্তে বিনাশ বা নির্ব্বাসিত করিতেছে; আর ঐ যে এক রমণী স্বদেশের জন্য পরের পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য, উলঙ্গকরবালধারী উদ্ধত দস্যুকে স্বীয় পুত্রের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে পথ প্রদর্শন করিতেছে; আর ঐ যে একটী দম্পতি ধর্ম্মের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য, প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য, উভয়ে মিলিয়া তরবারি দ্বারা স্বীয় প্রিয়তম সংসার-সর্ব্বস্ব পুত্ররত্নের মস্তকচ্ছেদন করিতেছে; ঐ যে আর এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পালন জন্য সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব ছাড়িয়া দিতেছে, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি নিজেকেও বিক্রয় করিয়া উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করিতেছে; আর কত বলিব? উহারাও কি আপনাদের অপেক্ষা কঠোরতর তপঃ সাধনা করেন না? তবে উহারা কঠোরতপা সংসারী, এবং আপনারা যদি হন, তবে কঠোরতপা সন্ন্যাসী। সংসারের নিগূঢ়তম রহস্য সকল উহাদের আয়ত্তাধীন, আপনাদের তাহা নহে। তাই বলিতেছিলাম, রাগ করিবেন না গুরুদেব! আপনি সন্ন্যাসী, (অবলার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন গুরুদেব!) আপনি এ রহস্য বুঝিবেন কেন?

যিনি আজ অবধূতরূপে আপনার সহযাত্রী, উহাকেই একদিন সংসার পথের চিরসহযাত্রী রূপে পাইয়াছিলাম। যিনি দাসরূপে আজ আপনার সেবক গুরুদেব! এ দাসী উহাঁরই দাসীত্ব করিবার জন্য সাদরে উহাঁরই চরণে শরণাগত হইয়াছিল। আপনার স্বামিত্বের উপলব্ধিতে যিনি আজ ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে আত্মহারা, উহাঁকেই একদিন স্বামিরূপে পাইয়া আমিও আত্মহারা হইয়াছিলাম। আর "একদিন" কেন, যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, যতদিন জন্ম-জন্মান্তর হইবে, যতদিন ব্রহ্মাণ্ড-

লীলা প্রবহমান রহিবে, ততদিন 'উনি আমার স্বামী আমি উহাঁর দাসী' এ মধুর সম্বন্ধ কখনও বিচ্যুত হইবে না। কা'ল উনি সংসারী ছিলেন, তাই আমি দাসী ছিলাম, আজ উনি সংসার-ত্যাগী বলিয়া আমি উহাঁর দাসী নহি, তাহা বিবেচনা করিবেন না। আপনাদের ধর্ম্মে কি বলে তাহা জানিনা; সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম অদ্য এক, কল্য অন্য; আমাদের ধর্ম্ম তাহা নহে। আমাদের ধর্ম্ম চিরকাল সমভাবে থাকিবে; কল্য আমি যাঁহার ধর্ম্মপত্নী ছিলাম, আজও আমি তাহাই। হিন্দুর দেশে বিধবা কন্যার সার্থকতা নাই, বৈধব্যেও স্ত্রী পতিকে হারায় না, এতক্ষণে বুঝিলেন কি গুরুদেব! আমি আসিয়াছি কেন?

একদিন যাঁহার দাসী ছিলাম, আজ তাঁহারই দাসীত্ব করিতে আসিয়াছি। আমার ভব-সংসারের প্রভু, দেহরথের সারথি, জীবন-তরণীর কর্ণধার, হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আমার হিন্দু জীবনের দুর্গোৎসব যাহাকে লইয়া, তিনি বিঘোর অরণ্যানীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তুষার-মণ্ডিত বন্ধুর হিমাদ্রি-শিখরে পরিভ্রমণ করিয়া করিয়া, অযত্নে, অনাহারে, অনিদ্রায়, অহর্নিশ যাপন করিবেন, কেহ তাঁহার সেবা করিবে না, কেহ তাঁহার মুখের পানে ফিরিয়া চাহিবে না, আমি দাসী হইয়া, সেবিকা হইয়া, তাহা সহ্য করিব কিরূপে? আপনাদের দেহ হস্তস্থিত ত্রিশূলবৎ কঠিন, হৃদয় যে পাষাণে বাস, সেই পাষাণবৎ কঠোর, আপনারা কঠোরতার অবতার বিশেষ, আপনারা আমার মনের ভাব বুঝিবেন কিরূপে? যাঁহার গায়ে একবিন্দু ঘর্ম্ম দেখিলে, ছুটিয়া আসিয়া অঞ্চলে মুছাইয়া বাতাস করিতাম, যাঁহার রাতুল-চরণ-মূলে একটী সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে, হৃদয়ে বজ্রাঘাত যন্ত্রণা অনুভব

করিতাম, যাঁহার খাইতে এক দণ্ড বিলম্ব হইলে নিজেই যেন অসহ্য ক্ষুৎপিপাসায় অধীর হইয়া পড়িতাম, যাঁহাকে অনিদ্রিত দেখিলে কখনও কোনও দিন নিজের চক্ষে নিদ্রা আসে নাই, যাঁহার প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডলে একটু বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হইলে, নিজের হৃদয়-তন্ত্রী পর্য্যন্ত একেবারে বেসুরা হইয়া যাইত—আজ তাঁহারই এই বিষম দুরবস্থার বিষয় ভাবিয়া সুস্থির থাকিব কিরূপে? তাঁহাকে পথের ভিখারী দেখিয়া, নিজেই বা সৌধ-শিখরে রহিব কিরূপে? এবার বুঝিলেন কি গুরুদেব! আসিয়াছি কেন?

একদিন যাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলাম, আজ তাঁহারই সদনে আমার সেই সহধর্ম্মিণী নামের গৌরব রক্ষা করিতে আসিয়াছি। আপনারা সন্ন্যাসী; আপনারা যাহার যাহার ধর্ম্ম সেই সেই একাকীই সম্পাদিত করেন; আমরা সংসারী, আমরা স্ত্রী পুরুষে একত্র হইয়া, প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে, মর্ম্মে মর্ম্মে, অস্থিতে অস্থিতে জড়িত হইয়া একই ধর্ম্ম, একই কর্ম্ম, একই উদ্যম ও যত্নের সঙ্গে, একই ভাবে সুসম্পন্ন করিতে অগ্রসর হই। আমি রমণী; পতির ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম; পতি আজ সন্ন্যাসী; আমি কেমন করিয়া সংসারী থাকিব? আমিও তাই আজ সন্ন্যাসী পতির পার্শ্বে সন্ন্যাসিনীরূপে দাঁড়াইতে আসিয়াছি। পতির যাহাতে ধর্ম্মোন্নতি হয়, পতি যে পথাবলম্বী হইয়াছেন, সেই পথে যাহাতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারেন, তাহাই আমার উদ্দেশ্য, তাহাই আমার সাধনা। আমি পতির ধর্ম্মপথের কণ্টক হইতে আসি নাই; সেরূপ যদি বুঝিয়া থাকেন, গুরুদেব! তবে আপনি পরম জ্ঞানী হইয়াও ভ্রান্ত মানবের মত অন্যায় ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। নারী হইয়া যদি

আমার সতীত্ব থাকে, আমার পতির যদি পতিত্ব থাকে, পুরুষ হইয়া যদি তাঁহার পুরুষত্ব থাকে, তবে আমার সাহচর্য্যে তাঁহার ধর্ম্মের পথ সুপরিষ্কৃত বই কণ্টকিত হইবে না। পুরুষ যেমন সংযমী হইতে পারে, নারীও তেমনি পারে, বরং অধিক পারে। আর সেইরূপ অধিক পারে বলিয়াই নারীর কার্য্যক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ, গতির পথ এত বদ্ধ হইয়াছে, নারীনীতি এত বাঁধাবাঁধি হইয়াও এখনও অটল আছে। নারী-হৃদয় কোমল বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে যথেষ্ট কঠিন হইতে পারে। গুরুদেব! নারী-হৃদয়ের অদম্য প্রকৃতির দৃষ্টান্ত কি কখনও নয়নগোচর করিয়াছেন?

গুরুদেব! আসিবার আমার আরও কারণ আছে। এক দিন যাঁহার প্রেমাধিকারিণী ছিলাম, আজ তাঁহারই নিকট প্রেমভিখারিণী হইতে আসিয়াছি। একদিন যাঁহার হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িতাম; যাঁহার প্রেম-তরঙ্গে আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেমাবর্ত্ত মিশাইয়া দিয়া আত্মহারা—দিশেহারা হইয়া যাইতাম; একদিন যাঁহার প্রেম-সর্ব্বস্বের পূর্ণ অধিকারিণী মনে করিয়া গরবে ডগমগ হইতাম, আজ সেই আমার প্রেমের ধনকে এক নবীন প্রেমে উচ্ছ্বসিত-হৃদয় দেখিয়া, সেই আমার আনন্দ-নিকেতনকে সচ্চিদানন্দের পূর্ণানন্দরসে পরিপ্লুত দেখিয়া, সমস্ত গর্ব্ব, সমস্ত অভিমান, সমস্ত স্বত্বোপধারণা বিস্মৃত হইয়া, সেই প্রেমময়ের পদপ্রান্তে প্রেম ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আজ তাঁহার সেই প্রবহমানা প্রেম-তরঙ্গিণী প্রবল সাগরে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া—আমার এই ক্ষুদ্র সংসর্পিতা হৃদয়-নির্ঝরিণীকে সেই সাগরে মিশাইতে আসিয়াছি। এ সূত্রবৎ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর প্রবাহ বিরুদ্ধগতি

বা বিরুদ্ধকামী হইলেই বা তাহাতে সাগরের কি? তাই বলিতেছিলাম গুরুদেব! আমার দ্বারা আপনার শিষ্যের ধর্ম্মহানি হইবেক না।

আপনি আজ আপনার শিষ্যের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, ধর্ম্মগুরু; আপনি তাঁহার সৎপথের পথপ্রবর্ত্তক, সৎপ্রবৃত্তির উত্তেজক, সদ্‌গতির নিয়ামক। তাই শিষ্যের উপর আপনার প্রভুত্ব অনেক, অধিকার যথেষ্ট, স্বত্ব সম্পূর্ণ। কিন্তু আপনার শিষ্যের উপর আমারও একদিন স্বত্ব ছিল; তবে আপনার স্বত্ব শিষ্য বলিয়া, আমার স্বত্ব গুরু বলিয়া, প্রভেদ এই। আর "ছিল"ই বা কেন বলি, এখনও আছে এবং চিরকাল থাকিবে। আপনার শুধু জীবন স্বত্ব, আমার স্বত্ব চিরকালের জন্য, জন্ম জন্মান্তরের জন্য। আপনি স্বত্বাধিকারী বলিয়া আমার স্বত্ব উচ্ছেদ হইবে মনে করিবেন না। অথবা তাহা মনে করিলেও ক্ষতি নাই; আপনার স্বত্বই প্রবল থাকুক। তবুও আমার অভিলাষ কি পূর্ণ হইতে পারিবে না?

একজন ধনী বহুজনপূর্ণ নগরীর কেন্দ্রস্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন; পুষ্করিণীর উপর স্বত্ব তাঁহারই থাকে, জল কিন্তু সহস্র লোকে সহস্র জীবে খায়। সে ব্যক্তি ঐ সরসীর স্বত্বাধিকারী বলিয়া কি তাহাতে কোনও অবলা রমণীর জল আনয়ন পক্ষে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়? অথবা কেহ জল আনিতে গেলে কি উক্ত ব্যক্তি তাহার উপর স্বত্ব প্রদর্শন করাইতে আসেন? কখনই নহে। সেইরূপ আজিও এই অভাগিনী বিষম বিরহানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরম যাতনায় ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া, বড়ই তৃষিত কণ্ঠে, বড়ই পিপাসিত হৃদয়ে, আপনার ঐ প্রেম-সরোবরের এক গণ্ডুষ জলপান করিতে

আসিয়াছে; সরোবরের উপর স্বত্ব আপনারই থাকুক, সে স্বত্বের বিষয় লইয়া কোন বাগ্‌বিতণ্ডায় আমার কাজ নাই। আপনার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা দাসী ঐ সরোবর হইতে অঞ্জলি পুরিয়া জলপান প্রয়াসিনী, অভাগিনীর প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে না?

কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি এক অসীম বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে বহু যত্নে এক পথিপার্শ্বে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করেন। বৃক্ষ যখন বড় হয় তখন ছায়াদানে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপিত শ্রান্ত পথিকবৃন্দের পথক্লান্তি বিদূরিত করিয়া থাকে। বৃক্ষের উপর স্বত্ব থাকে কিন্তু রোপকের; তাই বলিয়া কি তিনি ছায়াতলাশ্রিত পথিককে বিশ্রাম-লাভে বঞ্চিত করেন? পথিক তো স্বত্ব লইয়া বিচার করিতে চাহে না—সে চাহে শুধু আশ্রয়। তেমনি আপনি আপনার ঐ শিষ্যের হৃদয়-ক্ষেত্রে যে ধর্ম্মোপদেশের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মবৃক্ষ আজ যে শান্তির সুশীতল ছায়া প্রসারিত করিয়াছে, এ অবলা সংসার দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া, সেই প্রেম-প্রবাহিনী শীকর-সিক্ত শান্তিময়ী শীতল ছায়ার আশায় এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বৃক্ষের উপর স্বত্ব আপনারই থাকুক, অভাগিনীকে ছায়ালাভে বঞ্চিত করিবেন না।

কোন এক ধনীব্যক্তির পুত্র পরম দয়ালু। দারিদ্র্যগ্রস্ত, অনাহারক্লিষ্ট অসহায় অনাথ আতুরকে দেখিবামাত্র তাহার হৃদয়-কন্দরে দয়ার স্রোত পূর্ণভাবে প্রবাহিত হয়। তিনি দুঃখ-বিগলিতান্তঃকরণে অজস্র অর্থদান করিয়া, অভাবগ্রস্ত নিরাশ্রয়দিগের দুঃখমোচন করেন। তাহার দয়াবৃত্তির চরিতার্থতার উপায় স্বরূপ সেই অর্থে তাহার পিতারই অধিকার। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পিতা যদি মানুষের মত মানুষ হন, তাহা হইলে

তিনি কি তাহার পুত্রকে দরিদ্রের দুঃখমোচনে বাধা দেন? তাহার সুপুত্রের হস্তপ্রদত্ত অর্থ পাইয়া যখন দীনহীন ব্যক্তিরা মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুখানুভব করে, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক আনন্দাশ্রুজলে ভাসমান হয়, তখন কি তিনি সেই অভাগাগণকে সেই অমিয়-রসে বঞ্চিত করেন? কখনই না। তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের এই দীনহীনা কাঙ্গালিনী আজ আপনার ঐ মহৈশ্বর্য্যের অধিকারী শিষ্যের দ্বারে সদুপদেশরূপ অর্থের লাগিয়া, পুণ্যরত্নের অণুকণালাভে অভিলাষিণী হইয়া, ভিখারিণীবেশে উপস্থিত হইয়াছে। আপনার শিষ্যের উপর স্বত্ব আপনারই থাকুক, শিষ্যের সে ধনের উপর প্রভুত্ব আপনারই থাকুক, তবে অভাগিনীকে তাহার অণুকণালাভে বঞ্চিত করিবেন না।

হিমাচলের পদপ্রান্তে কত লক্ষ লক্ষ প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; যদি কোন ভক্ত একখণ্ড প্রস্তরকে শালগ্রাম ভাবিয়া ভক্তিভরে পূজা করে, হিমাচলের তাহাতে ক্ষতি কি? গুরুদেব! এক্ষণে বুঝিলেন কি স্বত্ব আপনার থাকিলেও আমার মনোভিলাষ কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে। তবে উহাতে আমার স্বত্ব আছে কিনা তাহার মোকদ্দমা আপনার নিকট উপস্থিত করিব না। যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তবে যিনি সকলের স্বত্বে স্বত্ববান্ এবং যিনি সকলের স্বত্বের বিষয়ীভূত, দীপ হইতে দীপ্ত দীপান্তরের মত সকলের সত্তা যাহা হইতে সম্ভাবিত এবং যিনি বাগ্‌বিতণ্ডাপূর্ণ মোকদ্দমা ব্যতীত সুবিচার করিয়া, সকলকে আপনগণ্ডা বুঝাইয়া দেন, সেই মহামহিম সুবিশিষ্ট বিচারকের বিরাট দরবারে একদিন আমার **স্বত্বের মোকদ্দমা** উপস্থিত হইবে।



মানহানির মোকদ্দমা।

[পর্ব্বত গুহায় এক অবধূতের উক্তি]

ভগবন্ !

তোমাকেই না সবে দয়াময় বলে ? তুমিই না দয়ার সাগর, করুণার সিন্ধু ? কই, আমি তো সে দয়ার কোন পরিচয় পাইলাম না ! সাগরে কি আমার চির-পিপাসিত শুষ্ককণ্ঠ ভিজাইবার জন্য এক বিন্দুও বারি নাই ? ঐ সিন্ধু কি আমারই বেলায় বারিবিন্দু-বিহীন ? তুমি নাকি অপার অনুগ্রহশালী ? সে অনুগ্রহ কি আমারই বেলায় শুধু নিগ্রহরূপে পরিণত হইয়াছে ? এ জগতের নাকি সবই অনিত্য ও অস্থায়ী, আর তুমিই নাকি একমাত্র নিত্য, সত্য ও সনাতন ? কই নিত্যানিত্যের ভেদাভেদ ত কিছুই বুঝিলাম না ! সংসারের সব সুখ, সব শান্তি—আশা—ভরসা, সবই বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি ! সংসারের যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু সুরম্য—যাহা কিছু সুললিত, এ দীনের সন্নিকটে একদিন যাহা কিছু সুখ-শান্তি-বিধায়ক ছিল, সবই তো পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি ! অহো নাথ ! সে কথা মনে হইলে, সে স্মৃতি—অতীতের সে সাধের স্মৃতি—হৃদয়পটে সমুদিত হইলে, মস্তিষ্ক যে বিঘূর্ণিত হয়, হৃদ্-পিঞ্জর যে ধ্বসিয়া যায়, মর্ম্ম-গ্রন্থি যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ! সেই ছবিগুলি—সংসারের সেই প্রেমানন্দ-পরিবর্দ্ধক, পূর্ণতোষ-পরিপোষক পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সেই একমাত্র দর্শনীয় সুন্দর দৃশ্যগুলি—সেই যাহা দেখিলে ভাঙ্গা মন গড়ে, ভাঙ্গা হাড় যোড়ে, সেই যা'তে পিপাসা

মিটায়, প্রেমাশা বাড়ায়, সেই যা'তে হরষে হাসায়, বিরহে ভাসায়—সে হাসানো কাঁদানো, মন মাতানো প্রাণহরা প্রতিমাগুলি আজ্ করামলকবৎ সুন্দর সুস্পষ্ট নিরীক্ষণ করিতেছি।

একদিন যাহাদের পাইয়া গর্ব্ব করিতাম, যাহাদের সুষমা সংস্পর্শে বসুমতীও আমার নিকট অমরাবতীতে পরিণত হইয়াছিল, যাহাদের ভক্তি ভালবাসা ও স্নেহের কেন্দ্রীভূত হইয়া নন্দন-বিলাসী শচীন্দ্রেরও সহিত সৌভাগ্য বিনিময় করিতে সঙ্কুচিত হইতাম,—আজ এই দূর—বহু দূর দেশে, পর্ব্বত-কন্দরে বসিয়া, বহুদিন পরে তাহাদেরই অমিয়মাখা বদনচন্দ্রিমা আমার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিয়া দিতেছে। আসিবার দিনে—তোমারই সন্ধানে সাধের গৃহবাস ত্যজিয়া, আসিবার দিনে—নিষ্ঠুর তুমি, তোমারই জন্য রাক্ষসিক নিষ্ঠুরতার প্রথম পরিচয় দিবার দিনে—যখন আমার সেই জীবন-তোষিণী, হৃদয়-নিকুঞ্জ-প্রেম-ক্রীড়া-প্রসারিণী সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি-সলিলাভিষিঞ্চনকারিণী, বন্ধুহীন আমার সেই প্রাণারাম ভূমি, ধনহীন আমার সেই ঐশ্বর্য্য-স্বরূপিণী—যখন আমার সেই শৈশবের ক্রীড়া-সঙ্গিনী, কৈশোরের সেই অকারণ ব্রীড়া-বিবর্দ্ধিনী, যৌবনের সেই প্রেম-কেলি-সঞ্জীবনী—যখন আমার সেই অসময়ের সহায়, বিপদাবর্ত্তের সাথী, শোক সন্তাপের ব্যথী, সর্ব্বোপরি আমার সেই সহধর্ম্মিণী—অহো! যাহার রূপের তুলনা নাই, গুণের অবধি নাই, ভালবাসার ইয়ত্তা নাই, অহো! একটী রেখার ন্যূনাধিক্যে যাহার মনোবিমোহন চিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য্য এক কালে বিনষ্ট হয় *—

* "One Shade the more. one ray the less
Had half impaired the nameless grace."
Lord Byron.

আমার আসিবার দিনে যখন আমার সেই প্রাণাধিকা প্রেয়সী গলা ধরিয়া, হস্ত ধরিয়া, চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া, অবশেষে আমার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া, কত যে কাতরভাবে, কত যে করুণ কণ্ঠে, কত যে বিলাপ করিয়াছিল—আজ্ তাহারই ধ্বনি—হৃদয়ের হাড়ে হাড়ে বাজিয়া বাজিয়া, তাহারই প্রতিধ্বনি যেন বিষ-শল্যের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিতেছে। ভুলিতে পারি না যে নাথ! সে দৃশ্য কি ভোলা যায়? মানুষ হইয়া রক্ত মাংসের শরীর বহিয়া, সে দৃশ্য ভুলিব কিরূপে? ঐ যে সেই বালিকাটীর ভু'লে ভু'লে "বাবা" বুলি, ঐ যে নবেন্দুবিনিন্দিত সুকুমার বালকটীর ফু'লে ফু'লে শত প্রকার ক্রন্দনের ভঙ্গিমাগুলি, ঐ যে সেই নানা কথা কাঁদিয়া, নানাভাব ছাঁদিয়া, অসংখ্য আপত্তি খণ্ডনের জন্য অবিরত তর্কের ছটা, আর অবশেষে ঐ যে, সেই পথের মাঝে দৌড়ে এসে, নয়ন জলে ভেসে ভেসে, দুই বৎসরের বালিকা হইতে পঞ্চবিংশবর্ষদেশীয়া রমণী পর্য্যন্ত, পুত্রকন্যা-সমন্বিতা প্রেয়সীর আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও চরণরেণুগ্রহণের ঘটা—ঐ যে, ঐ যে, ঐ সে সমস্তই যেন আমার নয়ন জলে ভাসিয়া উঠিতেছে! ইহা কি ভোলা যায় ভগবন্! এ যে দিন ভুলিব, (হরি হরি! এ যে ভোলা যায় না!) এ যেদিন ভুলিব—ভবধব! সেদিন যেন আমার ভবের খেলা সাঙ্গ হয়, পঞ্চভূতের লীলা-রহস্য যেন ফুরাইয়া যায়! পারিব না, পারিব না—অনন্ত জনম ধ'রে, অনন্ত নরকে, প্রলয়-অনলে, কোটি-কৃমি-কীট-দংশনে, চিরকাল জর্জ্জরিত হইব, সেও ভাল—তবুও পারিব না নাথ! এ দৃশ্য কভুও ভুলিতে পারিব না।

কত দিন তাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছি। পুত্রটী এতদিন বোধ হয়

বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে, বালিকাটী এক্ষণে বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে, পুত্র বোধ হয় উপার্জ্জন করিতেও শিখিয়াছে, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা বুঝিয়াছে—প্রিয়ার আমার বোধ হয় এখন আর তত কষ্ট নাই। কিন্তু কালের গতি কে বুঝিবে? তাহারা কোথায় কিভাবে কেমন আছে, তাই বা কে জানে? যদি তাহাদের অর্থাভাবে অশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়া থাকে! অহো! যদি তাহাদের জীবনের আশঙ্কা হইয়া থাকে! ওঃ কি নিষ্ঠুর আমি, কি পাষাণ-হৃদয় আমি, আমি কিনা তাদের ফেলিয়া রাখিয়া—নিরাশ্রয় নিঃসম্বল অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া—অকূল বিপদ সাগরে ভাসাইয়া দিয়া, সেই কত দিন হইল, তা'র পরে কত দিন গিয়াছে, কত রাত্রি গিয়াছে, কত ঋতু চলিয়া গিয়াছে, কত আশ্বিন মাস গিয়াছে, কত বসন্ত কাল গিয়াছে, কত কত বর্ষ চলিয়া গিয়াছে, এত কাল হইল এই দূরদেশে, পর্ব্বতের গুহায় মানুষের গন্তব্যের বাহিরে আসিয়া বাস করিতেছি। কেন বাস করিতেছি? তুমি কি জাননা হরি! কেন বাস করি? তুমি নাকি সবই জান, শুধু কি এইটুকু তোমার অবিদিত? কখনই নহে। তুমিও জান, আর আমিও এখানে বাস করি, তোমারই জন্য। গৃহবাস ত্যাগ করিয়াছি, তোমারই জন্য। স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তোমারই জন্য। আমার উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বসন নাই, মস্তকে তৈল নাই, সেও তোমারই জন্য। আমার ভাবনা ও চিন্তা, আশা ও ভরসা, ভক্তি ও প্রীতি সে সবও তোমারই জন্য। আমার লক্ষ্যস্থল তুমি, আশ্রয় স্থান তুমি, আমার প্রাণের প্রাণ, মনের বৃত্তি, দেহের শক্তি, হৃদয়ের দেবতা সকলই তুমি। আমার বিশ্বাস তোমাতে,

শান্তির আশা তোমা হইতে, সুখের প্রত্যাশা তোমা দ্বারা, অন্তরের টান তোমার দিকে। আমার কর্ত্তা তুমি, আমি তোমার দাস, দাসানুদাস। আমার কর্ম্ম তুমি, তোমারই সাধনা আমার কাজ। আমার করণ তুমি, তুমিই আমার সৃষ্টির কারণ। আমার সম্প্রদানের বস্তুও তুমি, তোমা ভিন্ন আমার অন্য সম্বল নাই। আমার অপাদান তুমি, তোমা হইতেই আমি আসিয়াছি, যাহা আছে তাহা তোমা হইতেই পাইয়াছি, সে সব তুমি অপদানই করিয়াছ। আমার আধার তুমি, তোমাতেই আমি রহিয়াছি। তুমিই আমার বিশেষ্য, তোমাকেই একমাত্র নিত্য পদার্থ বলিয়া জগৎ হইতে বিশেষ করিতে আমি ব্যস্ত। তুমিই আমার বিশেষণ, কারণ তোমা ব্যতীত আমি কিছুই নহি। তুমিই সর্ব্বনাম, তোমা ব্যতীত কোন্ বস্তুর নাম করণ হয়? তুমি অব্যয়, তোমার ব্যয় হইলে থাকে কি? তুমি অব্যয়, অক্ষয়, অসীম, অনন্ত, অকূল, অপার, অগম্য, অজ্ঞেয়। তোমার নামের বীপ্সা সকলের মুখে, তোমার সামীপ্য সকলের বাঞ্ছনীয়। অবশেষে তুমিই ক্রিয়া, মানুষে যাহা কিছু করে তাহা তোমারই সাধনা—অণুপরমাণুতে সর্ব্বঘটে যে তুমি বিরাজমান, সর্ব্ব কার্য্যে যে তুমি অধিষ্ঠাতা, সে তোমারই ক্রিয়া তুমিই করিতেছ এবং তুমিই করাইতেছ। যে অকর্ম্মক, তাহাকে তুমি কর্ম্মী কর, যে কর্ম্মী, তাহা দ্বারা তুমি মহৎ কর্ম্ম সাধিত কর। তোমার ইচ্ছাতেই আমাদের ইচ্ছা—তোমার কথাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, তোমার তত্ত্বের জন্যই আমাদের অনুসন্ধিৎসা, তোমারই কৃপাবারির জন্য আমাদের পিপাসা বলবতী হয়। আমার সন্ধিও বিশ্লেষ—ভোগ ও বিরহ, সকলই তোমার জন্য। আমার উদ্দেশ্য ও

বিধেয়, সাধ্য ও সিদ্ধি, সবই তুমি। জাগতিক সম্বন্ধ পরিবর্জ্জিত হইয়া লোকে তোমাতেই সমাসক্ত হয়; তোমারই রাসায়নিক সংস্পর্শে লোকে কি হইতে কি হইয়া যায়, কিছুই কিন্তু বুঝি না। আমার "আমার" বলিতে যাহা কিছু ছিল, এখন সকলই তুমি। আমার "আমিত্ব" পর্য্যন্ত তোমাকে দিয়া, আজ্ পথের ভিখারী হইয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তবুও তোমার দয়া হইল না? তোমার জন্য এত ছাড়িলাম, তোমার জন্য এত ধরিলাম, তোমার জন্য এত করিলাম, মরিলাম না কেন জানিনা,—এত কাঁদিলাম, তবুও তোমার দয়া হইল না। এত আগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া, এত যন্ত্রণা সহিয়া সহিয়া, এত হৃদয়ে ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া, এত অশ্রুতে ভাসিয়া ভাসিয়া, তোমার সাধনা করিলাম, তবুও তোমার দয়া হইল না! তোমারই জন্য ক্ষুধায় মরিতেছি, তৃষ্ণায় জ্বলিতেছি, শীতে কাঁপিতেছি, ভয়ে সন্ত্রাসিত হইতেছি, কত অপদস্থ ও অপমানিত হইতেছি; তবুও তোমার দয়া হইল না! তোমাকেই না লোকে দয়াময় বলে, করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু বলে? এই কি তাহার পরিচয়, সে নামের মহিমা কি এই? যে দুঃখের কাহিনী, মর্ম্মস্থলের যে লুকানো কথা আত্মীয় স্বজনকে বলি নাই, পিতামাতাকে বলি নাই, বন্ধুকে বলি নাই, স্ত্রীকেও বলি নাই, এমন কি যাহা নিজকেও কোন দিন বলি নাই, তাহাই না কত দিন যত্ন করিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমারই চরণে নিবেদন করিয়াছি! সে নিবেদনের ফল কি এই? ব্যথার ব্যথী হইতে, দুঃখের দুঃখী হইতে, যদি তোমাকে না পাইলাম, তবে তুমি দয়াময় কিসের? তোমার হৃদয় কি পাষাণ! তুমিও কি পাষাণ?

তাহা না হইলেই বা তোমা হইতে গঙ্গার উদ্ভবের কথা শুনিব কেন? কিন্তু তোমার ঐ চরণোদ্ভূত সুরধুনী-সলিলে লক্ষ লক্ষ লোকের দেহ-জ্বালা মিটিতেছে, পিপাসানল নির্ব্বাপিত হইতেছে, কোটী কোটী লোকের কোটী জন্মের দুরপনেয় পাপকালিমা বিদূরিত হইতেছে। আর তোমার কৃপা বারিতে আমার প্রাণের পিপাসা মিটিবে না, বিশ্বাস করিব কিরূপে? লোকে হৃদয়ের কাঠিন্যের সহিত পাষাণের উপমা দেয়। আমি তো দেখি পাষাণই সমস্ত জল-স্রোতের উৎপত্তিস্থল, পাষাণই সমস্ত কোমল পদার্থের আকর-ভূমি—পাষাণের শীতলতাই সমস্ত দেহের জ্বালা জুড়াইবার একমাত্র উপায়। পাষাণের উপরেই তো উৎস ছুটে, ফুল ফুটে, ফল ফলে, বরফ জমে, মলয় বহে, চন্দন বৃক্ষ জন্মে। তোমাতে তো ইহার একটীও নাই! তোমাতে দয়ার উৎস ছুটে কই, আনন্দের ফুল ফুটে কই, মোক্ষ ফল ফলে কই, শান্তির বরফ জমে কই, প্রেমের মলয় বহে কই; পবিত্রতার চন্দন সৌরভই বা বিচ্ছুরিত হয় কই?

তুমি পাষাণ নহ, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। পাষাণে যে গুণ আছে, তোমাতে তো তাহার কিছুই নাই! ঐ যে যখন কোন পথক্লান্ত পরিশ্রান্ত শুষ্ককণ্ঠ পথিক শিলাখণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে "জল দাও" "জল দাও" রবে চীৎকার করিবামাত্র পাষাণ গাত্র হইতে,—যেখানে বিন্দুমাত্রও জলরেখা ছিল না—সেই নীলিম নিথর পাষাণ গাত্র হইতে, ঝর ঝর ভাবে অবিরাম স্রোতে জলধারা নির্গত হইয়া তাহার পিপাসা নিবারণ করে। * কিন্তু তোমার নিকট

* শুনিয়াছি কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের কয়েক মাইল উত্তরে বাস্তবিকই এইরূপ একটি পাহাড় বিরাজিত আছে। পথিক অথবা যাত্রিগণ পিপাসাকুলিত হইয়া, তাহার

আজ এই কতদিন ধরিয়া, কত বর্ষ ধরিয়া প্রাণের পিপাসায় কাতর হইয়া "শান্তিবারি দাও" "শান্তিবারি দাও" বলিয়া এত উচ্চৈঃস্বরে এত ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিতেছি, তবুও তোমার হৃদয় বিগলিত হইল না, তবুও তোমার দয়া হইল না? তাই বলিতেছিলাম—তোমার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, বজ্রবৎ সুদৃঢ়। তুমি দীন-বন্ধু নহ; তুমি দিনবন্ধু—সুদিনের বন্ধু। অসময়ের নহ—তমসাচ্ছন্ন শর্ব্বরীতে তুমি সর্ব্বজনের অদৃশ্য হও। তোমারই জন্য চুরি করিলাম—অন্যের নিকট আমার যাহা কিছু ছিল,—ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ,—দয়া, মায়া, অনুগ্রহ,—সকলই তোমার জন্য চুরি করিয়া আনিলাম, তোমারই জন্য আমার যথাসর্ব্বস্বদিগের নিকট হইতে চুরি করিয়া পলাইলাম—এখন কিনা তুমিই আমাকে বল "চোর!" ঘৃণায় আমার বোধ হয় যেন আমার সঙ্গে কথা কওনা, আমি যে পথে থাকি ভ্রমেও সে পথ দিয়া হাঁট না, আর রাগে গরগর ভাবে বিদ্বেষবশে শাসাইয়া শাসাইয়া, তোমার চিরদূতী প্রকৃতিসুন্দরী দ্বারা বলিয়া পাঠাও যে আমাকে অনন্তকাল নরকে পচাইবে, কৃমিকীট দ্বারা দংশন করাইবে! এই তো তোমার স্বভাব! তোমাকে ভজিতে আসিয়া এত নির্য্যাতন পাইলাম, এত জ্বালাতন হইলাম, তবু কি বলিব তুমি দুঃখহারী হরি?

নিকটে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে "পানি দেও" "পানি দেও" বলিয়া চীৎকার করে। তখন ঐ শিলাপত্রে প্রথমে বিন্দু বিন্দু জল সঞ্চারিত হয়, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই ঐ জলবিন্দু সমুদয় একত্রিত হইয়া ধারারূপে পরিণত হয় ও পর্ব্বত গাত্র দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন পিপাসিত পথিক পাণি পাতিয়া পয়োধারা পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। বিধাতার বিধানে কোথায় কি আছে, কে জানে?

তুমি দুর্গতিহরণ, শান্তিসুখ বিধায়ক? তুমি ঘোর নিষ্ঠুর, অত্যন্ত নির্দ্দয়, অতীব নির্ম্মম।

কিন্তু আমার প্রতি তোমার দয়া না হইল, তাহাতে ক্ষতি নাই। তবে ঐ যে ভীষণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বৃদ্ধ, যাহার নড়িবার শক্তি নাই, চলিবার ক্ষমতা নাই, খাদ্য দ্রব্য পাইলেও হাতে ধরিয়া তুলিয়া খাইবার সাধ্য নাই,—ঐ যে সেই দীনহীন কাঙ্গাল আত্মীয়স্বজন-বিরহিত হইয়া পথের ধারে পড়িয়া ক্ষুধার জ্বালায় রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—উহায় প্রতি কি তোমার দয়া হয় না? আর ঐ যে আর এক শতগ্রন্থি-পরিণদ্ধা জন্মান্ধা অনাথিনী রমণী, সংসারে যাহার ঘর নাই, দ্বার নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, ভূমণ্ডলে যাহার আপনার বলিতে কেহ নাই—ঐ যে সেই আলুথালু কেশা, বিকৃতবেশা, ক্ষুৎপিপাসায় পরিক্লান্তা হইয়া তৃষিতা চাতকিনীর মত "অন্ধকে খেতে দাও, কাণাকে খেতে দাও—নাচারকে খেতে দাও"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে, উহারও প্রতি কি তোমার দয়া হয় না? আবার একমাত্র সংসারের সম্বল, নয়নের মণি, অন্ধের যষ্টি, ভবিষ্যতের আশাস্বরূপ পুত্র-রত্নকে হারাইয়া ঐ যে আর এক ভীষণ দরিদ্রতানল-প্রপীড়িতা সহায়-সম্পত্তি-পরিশূন্যা অভাগিনী জননী পুত্রের মৃতদেহ কোলে করিয়া বিঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে ভূতপ্রেত-সঙ্কুল বিভীষণ শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়া—আজ যাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, আশা নাই, ভরসা নাই, সংজ্ঞা নাই, চেতনা নাই, জগতের অস্তিত্বের জ্ঞানও যাহার বিলুপ্ত হইয়াছে—ঐ যে সেই শোক-সাগরে ভাসমান পাগলিনী অজস্র অশ্রু-জলে ভাসিতে ভাসিতে সব ভুলিয়া গিয়া—"অসময়ের সহায়, অনাথের

নাথ” বলিয়া তোমাকেই ডাকিতেছে—উহার প্রতিও কি তোমার দয়া হয় না? তুমি বলিবে, “উহারা পূর্ব্বজন্মে যেরূপ পাপ কার্য্য করিয়াছে, এ জন্মে তাহারই ফলভোগ করিতেছে, উচিত বিচার করাই আমার প্রকৃতি; উহাদের কর্ম্মফল বিবেচনা করিয়া উহাদের প্রতি ঐরূপ শাস্তিরই বিধান করিয়াছি।” তাই ধরিলাম; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি নিজের কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিবে, নিজের শক্তিতে যে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহাই যদি তাহার ভোগ্য হয়, তবে এ জগতে দয়া অনুগ্রহ সহানুভূতি প্রভৃতি কথাগুলির সৃষ্টি কেন হইয়াছে? তুমিই বা মাঝখানে বসিয়া “দয়াময়” নাম ফলাও কেন? অভাবগ্রস্ত না হইলে কি কেহ কাহারও দ্বারস্থ হয়? ঐ এক ব্যক্তি কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাণ্ডার সচ্ছল হইলে গৃহে সম্বল থাকিলে ও ব্যক্তি সতত ঐরূপ হীনবৃত্তি অবলম্বন করিবে কেন? যাহার খাইবার নাই, উদরে অন্ন নাই,—সেই তো খাইতে চায়; উদর পূর্ণ থাকিলে, গৃহে সম্বল থাকিলে, কে ভিক্ষোপজীবী হয়? বিপদে না পড়িলে কে ত্রাণকর্ত্তাকে “ত্রাহি ত্রাহি” বলিয়া ডাকে? ঐ কুষ্ঠরোগাক্রান্তা বৃদ্ধা, অনাথিনী অন্ধা, পুত্রশোকে পাগলিনী মাতা,—সংসারের ঐরূপ শত প্রকার অভাবগ্রস্ত দীন দরিদ্রগণ সকলেই পাপী ছিল, স্বীকার করিলাম। আর পাপী বলিয়াই তো আজ কষ্ট পাইতেছে এবং কষ্ট পাইতেছে বলিয়াই তো—তোমার দয়ার পাত্র। উহাদেরও প্রতি তোমার দয়া হয় না? দয়া থাকিলে তো হইবে। সাধে কি বলিতেছিলাম যে তুমি নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম?

তুমি পার সুধু ধনীর গৃহে ধন ঢালিতে, পূর্ণ ভাণ্ডার আরও পুরাইতে,

আর তৈলাক্ত মাথা তৈল-নিষিক্ত করিতে। ভিখারীর পর্ণকুটীর, রোগার্ত্তের আবাসস্থলী তোমার চক্ষুতে পড়ে না—তুমি চাও রাজার রাজপ্রাসাদ আর ধনীর হর্ম্মাশালা। যখন জুড়ি গাড়ী হাঁকাইয়া স্বর্ণাট্টালিকা-বাসী রাজার সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত "দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত-গৃহদ্বার" অভিমুখে ছুটিয়া যাও—তখন পথের পার্শ্বে পড়িয়া আমারই মত কত কাঙ্গাল ক্রন্দন করিতেছে, দেখিতে পাইবে। তাহাদিগকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিও না—পাপী বলিয়াই তাহারা তোমার দয়ার পাত্র। তাহাদিগকে দয়া করিয়া, তোমার মধুমাখা দয়াময় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিও। দেখিতে পাইবে—এ হতভাগা তাহাদেরই মধ্যে অন্যতম। আর যাহাদিগকে দেখিতে পাইবে———

"আতর সঞ্চিত নাই বঞ্চিত সাঁতারে
মানসে মনন যেতে পয়োনিধি পারে,"

অকূলের কাণ্ডারী তুমি, তাহাদিগকে ভবসিন্ধু পার করিয়া দিও। দীনবন্ধু হে, এ দীন আর কিছুই ভিক্ষা করে না। তোমারই জন্য পথের ভিখারী হইলাম, এখন তোমাকেই আমার মত কাঙ্গালেরা যখন নিন্দা করে—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া অভিহিত করে, তখন বুকে তাহা বড় বাজে, হৃদয়ে তাহা সহেনা, মর্ম্মস্থল ধ্বসিয়া যায়, তাই বড় খেদে, কি জানি কি মোহের বশে, তোমাকে বড় গালি দিয়াছি।

ইচ্ছা ছিল না, তবুও কি জানি তোমার কি নিগূঢ় রহস্যোদ্ভেদের অযথা অভিমানে বিভোর হইয়া, তোমার প্রতি অনেক কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছি। বড়ই গালি দিয়াছি, অসংখ্য কুৎসা রটাইয়াছি, তোমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্কারোপ করিয়াছি—অতি কর্কশকণ্ঠে, অতি রূঢ়ভাবে

তোমাকে অপমানিত করিয়াছি—আমার মত দীন দুঃখীর পক্ষপাতী হইয়া তাহাদের নিকট তোমার মহতী প্রতিপত্তির লাঘব করিয়া দিয়াছি; তাই মনে হয়, তুমি রাগ করিতে পার, তোমার **মানহানি** করিয়াছি বলিয়া **মোকদ্দমা** করিতে পার। ইচ্ছা হয়, তাহা করিও; আমি তাহাতে ভয় করি না। তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, মোকদ্দমা করিবে কাহার কাছে? তোমার মোকদ্দমার বিচার করিবে কে? তোমার নিজের মোকদ্দমার বিচারক যদি তুমি নিজেই হও, তাহা হইলে তোমার বিচার আমি গ্রাহ্য করিবনা। তুমি জাননা কি পরমেশ! কোন্ সাহসে এত কথা বলি?



নূতন ও পুরাতন।

এক যায়, আর আসে। যাহা যায়, তাহা পুনরায় আসে কি না সাহস করিয়া বলিতে পারি না; তবে যাহা আসে, তাহা যায়, সেটী নিশ্চিত। কা'ল যাহা ছিল নূতন, আজ তাহাই পুরাতন; কা'ল যাহার কথা স্বপ্নেও ভাবি নাই, আজ তাহাই নূতন হইয়া নূতন চিন্তার উদ্রেক করিয়া দিতেছে। কিন্তু পুরাতন হওয়াই যেন পদার্থ মাত্রের ধর্ম্ম; নূতন ঐ পুরাতনেরই একটী ক্ষণস্থায়ী নামান্তর মাত্র। বিষয়মাত্রই খরস্রোতা প্রবাহিনীর মত অতীত মহা-সাগরে মিশিবার জন্য সতত ধাবমান; এই অতীতে যাইবার পথে বর্ত্তমানের সঙ্গে ক্ষণিক সাক্ষাৎ হয় মাত্র। কিন্তু ঐ প্রবাহ-পথের কোন্ স্থানকে যে বর্ত্তমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিব, তাহার স্থিরতা নাই। মানব-বুদ্ধি, মানব-দর্শন, মানবানুসন্ধিৎসা এই স্থিরতার জন্য চিরলালায়িত কিন্তু চির-পরাহত।

তাড়িতোৎপাদক যন্ত্রে সংলগ্ন দুইটী বিভিন্নমুখী তারের প্রান্তদ্বয় নিকটবর্ত্তী হইলে যেমন একটী হইতে বিদ্যুৎ অপরটীতে প্রবেশ করে, সেইরূপ আমাদের মনে হয়, অনন্ত ঈশ্বর হইতে অতীত ও ভবিষ্যৎ নামক দুইটী কাল্পনিক তার অনন্ত শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া অনন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে; উহাদেরই মধ্যে ভবিষ্যৎ অতীতে পরিণত হইবার সঙ্কীর্ণ পথটুকু আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, উহাকেই "বর্ত্তমান" সংজ্ঞা প্রদান করি, এবং উহাই বিদ্যুতের মত চাকচিক্য প্রদর্শন করে। বিদ্যুৎ যেরূপ অত্যন্ত বেগবান্, আমাদের বর্ত্তমান কালের প্রবাহও সেইরূপ। কিন্তু এই অতীত ও ভবিষ্যৎ একই পদার্থ; একই তারের বিভিন্ন অংশ।

তাড়িত যন্ত্রে যেরূপ প্রথম তার হইতে বিদ্যুৎ বিনির্গত হইয়া দ্বিতীয় তারে প্রবাহিত হইতে হইতে, আবার যন্ত্রের মধ্যবর্ত্তী তার দিয়া প্রথম তারে পৌঁছে, এবং তখনই বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্পূর্ণ হয়, ভবিষ্যৎও সেইরূপ বর্ত্তমানের মধ্য দিয়া অতীতে মিশে, আবার অতীত হইতে অতীতাতীত ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তিতা দিয়া ভবিষ্যতের সৃষ্টি করে, এবং এইরূপে অনন্তকালের প্রবাহ সম্পূর্ণ হয়। বর্ত্তমানের বৈদ্যুতিক জ্যোতি দেখিয়া আমাদের নয়ন ঝলসিয়া যায়, প্রাণমন মোহিত হইয়া যায়, আমরা তাহার অস্থিরতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, নানা প্রকার মনোহর সংজ্ঞায় তাহাকে বিজ্ঞাপিত করি—ইহারই একটী সংজ্ঞা "নূতন"। অতীতের স্মৃতিপট উদ্‌ঘাটন করিতে আমরা মর্ম্ম ব্যথিত, ভবিষ্যতের আস্তরণ উদ্ভেদ করিতে আমরা শক্তি-বর্জ্জিত, বর্ত্তমান পাইয়া আমরা আনন্দে আত্মবিস্মৃত।

যদিও বর্ত্তমান বলিয়া পৃথক্ কোনও পদার্থ নাই সবই অতীত বা ভবিষ্যৎ তথাপি আমরা অতীত ভবিষ্যৎ চাই না—চাই শুধু বর্ত্তমান। পুরাতনকে নূতন করিয়া লইতে সততই আমরা ব্যগ্র হই। পুরাতনের গাত্রে নূতন নাম দিয়া ক্ষণিক সুখানুভব করি। প্রকৃতির সাম্রাজ্যে দেখি, কোকিল-কূজন, নদীর কল্লোল, কখনও পুরাতন হইল না; মানবসাম্রাজ্যেও কবির গাথা ও শিশুর কথা পুরাতন হইল না। কিন্তু যাহা প্রকৃতই ক্ষণভঙ্গুর মানব তাহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে ফেলিতে চায়। পঞ্জিকা কখন ও পুরাতন হইল না, শত বৎসর পূর্ব্বের পঞ্জিকা খুলিয়া দেখি, তাহার নাম রহিয়াছে "নূতন পঞ্জিকা"; York একদিন New York হইয়াছিল আজ দুই শতাব্দী পরেও তাহাই

আছে; ভগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত ইষ্টকরাশি আজিও "নূতন বাড়ী" নামে কথিত হইতেছে; শতজীর্ণ বিপণির মসীমলিন গাত্রে আজও চিত্রিত রহিয়াছে "নূতন বাজার"; একদিন এক নবাগত পৌরবধূ নবানন্দের পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে "নূতন বৌ" নামে কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন, আজ প্রপৌত্র-বধূর সমাগম সময়েও তাহার সে নাম ঘুচিল না; শতাব্দীজীবী সরোবর, বহুবর্ষ বয়স্ক রাজপথ আজিও "নূতন" সংজ্ঞায় বিজ্ঞাপিত হইয়া আসিতেছে; চিরপুরাতন সংসারে শুধু নূতনের ছড়াছড়ি। কোনও অর্থ থাকুক বা না থাকুক, আমরা নূতন কথাটাই ভালবাসি। মহাসাগর হইতে এক গণ্ডুষ জল উঠাইয়া, তাহার সহিত নূতন সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়া নূতন করিয়া লই; অনন্তকালের একটী ক্ষুদ্রতম অংশকেও পৃথক্‌ভূত করিয়া তাহাকে নূতন বৎসর সংজ্ঞা দিয়া এক নূতন আনন্দোৎসবের সৃষ্টি করি। আজ্ সেই নববর্ষ—আজ্ আমাদের আনন্দের দিন!

আজ্ আমরা হাসিতেছি—কিন্তু এ হাসি স্বাভাবিক নহে। মানব প্রকৃতিতে কান্নাই স্বাভাবিক, হাসি কৃত্রিম। দুঃখ-সংস্পর্শে আমরা যেরূপ হাড় ভাঙ্গিয়া কাঁদিতে পারি, সুখ-সংবাদে কি সেইরূপ হাসিতে পারা যায়? আবার আমাদের বেলায় কান্নার কারণগুলি স্বাভাবিক, হাসির কারণগুলি কৃত্রিম। দুঃখ দুর্ব্বিপাক আমাদের সাথের সাথী, সুতরাং সর্ব্বদাই আমরা কাঁদিতেছি; কিন্তু হাসির বন্দোবস্তের জন্য আমাদিগকে যত্ন করিয়া, অর্থব্যয় করিয়া, কলকৌশল করিয়া উৎসব খুলিতে হয়। আজ আমাদের হাসির দিন নহে, তবুও হাসিতেছি—সে শুধু জোর করিয়া।

হাসি, বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, ক্রন্দন, ভিতর

হইতে বাহিরে আসে। হাসি যখন ভিতরে যায়, তখন চর্ম্মপট অতিক্রম করিতেও বুঝি পারে না; কিন্তু ক্রন্দন অন্তরের অন্তস্তল হইতে স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া, বাহিরে অশ্রুধারা রূপে পরিণত হয়। হাসি বাহিরের আলোক; কান্না ভিতরের আঁধার। আঁধারই জগতের ধর্ম্ম; আঁধারকে আলো করিবার জন্যই সূর্য্যের উদয় হয় এবং আমরা ক্ষুদ্রমতি মানব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালি। আর কান্নাকে ঢাকিবার জন্য, দুঃখ যন্ত্রণার ভীমভীষণ ভৈরব মুর্ত্তি লুকায়িত করিবার জন্য, আমরা হাসির উচ্ছ্বাস উদ্ভাবিত করি। বর্ষ ভরিয়া শত কষ্ট সহিয়াছি, শত জ্বালায় জ্বলিয়াছি, শত বিঘ্ন শত বিপদ্ অতিক্রম করিয়াছি, সেই করুণ কাহিনী—দারুণ চিত্র ক্ষণেকের তরে বিস্মৃত হইবার জন্য নবোৎসাহে নববর্ষের নবোৎসবের আয়োজন করিয়াছি। তাই আজ হাটে মাঠে, সমৃদ্ধ সহরে, সুদীন পল্লীতে, যেখানে সেখানে হাসির বাজার বসিয়াছে। অট্টহাস্যে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত!!

এই হাসির অর্থ কি? এ হাস্য-পরিহাসের অন্তরালে যে ভয়ঙ্কর নারকীয় ছবি রহিয়াছে, তাহা দর্শনপথবর্ত্তী করিয়া কাজ কি? কিন্তু নববর্ষ! শত চেষ্টা করিয়াও কি দারুণ স্মৃতিরেখা মুছিয়া ফেলা যায়? নববর্ষ! তুমি আসিতেছ, জগৎ হাসিতেছে, ফলভারনত সহকার ভক্তিভরে প্রণতি করিতেছে, বিহগ-কাকলীতে বৈতালিক গীতির সৃষ্টি হইয়াছে, কোকিল পঞ্চমে নহবত তুলিয়াছে, আমরাও সব কর্ম্ম ফেলিয়া, ঘর্ম্ম-বিগলিত অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে করিতে, সেই বাদ্যোদ্যমে রত হইয়া কৃতবিদ্যতার পরিচয় দিতে বসিয়াছি; কিন্তু দেখিলে, দেখিতে পাই—এ বৈচিত্র্যের অভ্যন্তরে কুচিত্রের ছায়া বর্ত্তমান; শুনিলে, শুনিতে পাই—এ উচ্চ কণ্ঠ,

উধাও সঙ্গীতের অন্তরালে এক মর্ম্মভেদী করুণ কণ্ঠ বিদ্যমান। নববর্ষ! হর্ষে আমরা যতই উল্লাসিত হই না কেন, তবুও মনে পড়ে—ভুলিতে পারি না—তুমি কত বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি করিতে করিতে, কত রোগনির্য্যাতন ও দুর্ভিক্ষ প্রকোপে ভারতবাসীকে প্রপীড়িত করিতে করিতে, কত শোকাশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসে স্বীয় দেহ কলঙ্কিত করিতে করিতে, কত ভাবে কত জনকে জ্বালাতন করিয়া, আজ নবীন প্রীতিতে ঢল ঢল হইয়া, নবীন বেশে নূতন নাম ধারণ করিয়া, ভারতক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছ। কত অনাথ আতুরের জীবন-সম্বল শিশুসন্তান ক্ষুধার জ্বালায় তোমার অঙ্কে চিরনিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। কত রাজ-প্রাসাদের হৃদয়-মাণিক বসন্ত বিসূচিকায় জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। অনাথ, বিধবা ও পিতৃমাতৃ-হীনের সৃষ্টি করিতে করিতে, নীরো-নাদিরের অবতার দুরন্ত প্লেগ-দস্যু কত স্থান রুধিরাক্ত করিয়াছে! ভীম ভূকম্পনে কত সাধের সৌধচূড়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছে, বানবাত্যায় কত কৃষককুটীর ভাসিয়া গিয়াছে। কত রাজ-নিকেতন চিতাতে পরিণত হইয়াছে, কত নর-কোলাহল-কুহরিত পল্লী চিতা-চুল্লীর লীলাভূমি হইয়াছে। সে স্মৃতি, সে কঠোর স্মৃতি ভুলিতে পার কি?

কিন্তু তবুও নববর্ষ! আমরা অদৃষ্টবাদী মানব; আমরা শিখিয়াছি "গতস্য শোচনা নাস্তি," আমরা জানি "যৎভাব্যং তৎ ভবিষ্যতি" তাই তুমি যতই শত্রুতাচরণ কর না কেন, যতই কঠিন আঘাতে আমাদিগকে জর্জ্জরিত কর না কেন, আমরা ক্ষমাশীল হিন্দুর হৃদয় লইয়া সব ভুলিতে জানি। তাই অতীতের ঐ বিষাদ ছায়া ঢাকিয়া রাখিয়া, আজ তোমাকে দেখাইব আমরা কেমন করিয়া অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে, হাস্-

রাগ-রঞ্জিত-বদনে, অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করিয়া থাকি। কেমন করিয়া পর-সেবা করিতে হয়, হিন্দুর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, হিন্দুর রুধিরের স্বত্বাধিকারী হইয়া, তাহা আমরা জানি; তাই নববর্ষ! আজ্ প্রসন্ন চিত্তে তোমাকে আরও প্রসন্ন করিবার জন্ত হংস-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সেই একই স্মৃতিপট হইতে তোমাকে জানাইব, কালো'র পাশে সাদা আছে, ছায়ার পাশে আলো আছে, ছায়া আছে বলিয়াই আলো এত উজ্জ্বল, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ এত প্রিয়। দেখাইব, তুমি কত ক্ষুধিতের কোলে অন্ন দিয়াছ, কত মায়ের কোলে রত্ন দিয়াছ, কত দরিদ্রকে ধনী এবং ধনীকে রাজা করিয়াছ, কত দেশকে উন্নত করিয়া মরু-তটে তটিনী সংযোগ করিয়া দিয়াছ, হাস্তরোলে ক্রন্দন কোলাহল তুষ্ণীভূত করিয়াছ। সেই শক্তি, সেই প্রকৃতি লইয়া আবার কি আসিতে পার না? তাই এস, অশ্রু মুছাইতে, হাসি ফুটাইতে, আবার এস। আমরা অন্ততঃ স্বার্থের লোভে পুষ্পমালা লইয়া আনন্দে তোমায় আবাহন করিব। নূতন ও পুরাতনের এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া করুণকণ্ঠে ডাকিতেছি—নূতন বর্ষ! আবার এস! ভারতবর্ষে হর্ষ পারাবার বহাইতে আবার এস! আর আসিয়া বল, তুমি চির পুরাতন হইয়াও চির নূতন।



সমুদ্র-কূলে।

সমুদ্র! বহুদূর হইতে আসিয়াছি। বহুদিনের সাধনা ও কল্পনার পরে আসিতে পারিয়াছি। তোমাকে আর কখনও দেখি নাই, তাহা নহে; তবে সে অনেক দিনের কথা, দেখিয়াছি কিন্তু দেখার মত দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছি তাহাও মনে নাই। বিশেষতঃ আর যখন তোমার নিকট আসিয়াছিলাম, তখন উৎসাহ দেখাইতে আসিয়াছিলাম; আজ আসিয়াছি উৎসাহের ভিখারী হইয়া। দাতাকে ভিখারী যেমন বুঝে, আর কেহ তেমন বুঝিতে পারে না। আজ আমি রোগক্লিষ্ট তনু এবং শোকক্লিষ্ট চিত্ত লইয়া তোমার পানে ছুটিয়া আসিয়াছি। আসিয়াছি বড় সাধে, বড় আশায়—আসিয়াছি তোমাকে দেখিতে, তোমার কূলে বসিতে আর তোমার কোলে নাচিতে; আর যদি এমন ভাগ্য আমার থাকে এবং এমন কৃপা তোমার হয়, তবে এ নর-কঙ্কাল তোমার অঙ্কে ভাসাইয়া দিয়া এ মর-জীবনের সহিত চির বিদায় গ্রহণ করিতে।

তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে বহুদূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া, প্রথমেই তোমার গর্জ্জন শুনিলাম। কিয়দ্দূরে বহুলোকসমাকীর্ণ সহরের কোলাহলের মধ্যে, রেল গাড়ীর নির্ঘোষ, শকটের ঘর্ঘর শব্দ প্রভৃতি সকল শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম—তোমার মেঘনিনাদতুল্য সুগম্ভীর গর্জ্জন; তাহার বিরতি নাই, অথচ তাহা শুনিতে শ্রুতিরও বিরক্তি নাই। দিবারাত্রি সমভাবে একই প্রকার হুহুঙ্কার; কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিলে যেমন এক প্রকার সুগভীর হুহুধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, একটু মাত্র প্রকৃতিস্থ থাকিলেও সেইরূপ দূর হইতে তোমার এক অপূর্ব্ব

সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করা যায়। তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে শুনিয়াছি; শুনিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। প্রথমে দূর হইতে দেখিলাম, যেন সম্মুখে এক অনন্ত বিস্তৃত ধূম্রপটলসমাকীর্ণ শীত-শিশির-সিক্ত প্রকাণ্ড প্রান্তর। তখনও সম্পূর্ণ নিশাবসান হয় নাই। তোমার কায়া প্রস্তরবৎ সুকৃষ্ণ ও মসৃণ বোধ হইতেছিল। শীতের প্রারম্ভে হিমাদ্রি-শিখরে রাত্রিকালে তুষারসঞ্চারের মত, স্থানে স্থানে তোমার সেই কৃষ্ণ তনুর উপর ফেনপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল। কুয়াসার মধ্যে বালুকার পথে অগ্রসর হইতে হইতে, যাহাকে প্রথমে মল্লিকাপুষ্পের রম্যোদ্যান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, পরে দেখিলাম, সে উদ্যান নহে, সে তোমার ফেনিল তরঙ্গের ফেনের খেলা। তাহারই সন্নিকটে বালুকার উপর বসিতে না বসিতে দেখিলাম, দূর প্রান্তে দিগ্বলয় অনল-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম, তমসাগর্ভে হীরকমণির মত তোমার দেহের মধ্যেই ভানুপ্রতিমা সুবিম্বিত হইয়াছে। উদয়ের পূর্ব্বে এমন দর্শন তোমার হৃদয়ে ভিন্ন অন্য কোথায়ও সম্ভবপর নহে। অচিরে অর্দ্ধোত্থিত সূর্য্যদেব লক্ষ রশ্মিরেখায় জ্যোতির্ম্মালা বিচ্ছুরিত করিয়া দিলেন। অমনি তোমার প্রস্তরমসৃণ কায়ার সর্ব্বত্র যেন রক্ত-কোকনদ ফুটিয়া পড়িল। নিম্নভাগে জবা-কুসুম-সঙ্কাশ সূর্য্যকান্তি এবং উপরিভাগে যেন জলন্ত হোমাগ্নি হইতে বিভিন্নমুখী শিখাজাল গগন-পট ছাইয়া ফেলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখি সমুদ্র-শায়িতা প্রকৃতি রাণীর কুয়াসা-কুন্তলের সন্নিকটে আকাশ-ভালে সিন্দুর কোটার মত বালার্ক শোভা পাইতেছেন। অমনি দিগ্-দিগন্তে রবিরশ্মিতে স্বর্ণরেণু ছড়াইয়া দিল, স্তর স্তর ভাবে রেণুরাশি যেন কূলের পানে আসিতে লাগিল। কিছুদূর আসিয়াই বোধ হইল যেন

রেণু ডুবিল, তরতর গতি ডুবিল, ক্ষুদ্র বীচিরাজি হইতে প্রকাণ্ড তরঙ্গের সৃষ্টি হইল। এক একটি তরঙ্গ যেন দুরবিস্তৃত সুদীর্ঘ পাহাড়শ্রেণীর মত। সে সলিল-পাহাড়গুলি আসিতে আসিতে, প্রবলবেগে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ফেন উদ্গীরণ করে। পুনরায় তাহারা সেই ফেন-কিরীট মাথায় করিয়া তীরের দিকে ছুটে, ছুটিতে ছুটিতে উর্দ্ধদিকে কাঁপিয়া উঠে এবং প্রকাণ্ড সর্পফণার মত ক্রমে বাঁকাইয়া ভীষণবেগে এবং ভীম বিক্রমে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং চারিধারে বারিধারা ছিটাইয়া দিয়া, ফেনমালার উৎপত্তি করে। এইরূপে যাইতে যাইতে যখন অল্পজলে সৈকত-পুলিনের বালির শয্যায় এই তরঙ্গশ্রেণীর পাদস্পর্শ হয়, তখন সেই বিঘূর্ণিত সলিল রাশি ফেনাস্তরণে তনু ঢাকিয়া বেলাভূমিতে শুইয়া পড়ে এবং শান্তভাবে গড়াগড়ি দিতে দিতে তীরের দিকে বহুদূর অগ্রসর হয়। হঠাৎ বোধ হয় মনে পড়ে যে অনন্ত প্রেমাধার সাগরবক্ষ ছাড়িয়া বহুদূর আসিয়াছে, অমনি যাহা কিছু সঙ্গে থাকে, সব ফেলিয়া রাখিয়া, পাগলের মত আলু থালু হইতে হইতে ফেনের আবরণ বিপর্য্যস্ত করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যায়।

এইরূপে তোমার লহরী উঠিতেছে, পড়িতেছে, চলিতেছে, ফিরিতেছে, নাচিতেছে, গাহিতেছে। দেখিতে দেখিতে, তোমার পার্শ্বে বালুর শয্যায় বসিয়া পড়িয়াছি। তুমি চিন্তার জলধি, অবিরত আমার মনোমধ্যে নানা চিন্তা জাগাইয়া দিতেছ। তোমার তরঙ্গগুলি কূলের অতি সন্নিকটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; কতকদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিয়া, আবার ফিরিয়া যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সৈকতের সমস্ত চিহ্ন, সমস্ত রেখা, সমস্ত লেখা মুছিয়া দিয়া যাইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কত কি

নূতন চিহ্ন, নূতন রেখা এবং নূতন লেখা রাখিয়া যাইতেছে। দেখিয়া— সেই ঢেউগুলির গড়াইয়া আসা এবং গড়াইয়া যাওয়া দেখিয়া, মনে হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্রে যেন কি মুদ্রিত হইতেছে। যন্ত্রের যন্ত্রী কোথায়, তাহা জানি না, কল কিন্তু অবিরত নিয়মমত প্রায় অবিকৃত বেগে চলিতেছে। সৈকত-পুলিন যেন তাহার অক্ষর-সমাকুলিত মুদ্রা-ক্ষেত্র; "কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে"—তুমিই তাহার মস্যাধার। তোমার তরঙ্গসমূহ যেন মসী বিলেপন জন্য বর্ত্তুলাকার মসীদণ্ড। মুদ্রা-যন্ত্রে একখণ্ড কাগজ ছাপা হইবা মাত্র যেরূপ মুদ্রিত কাগজখণ্ড সরিয়া যায়, এবং তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ কয়েকটি দণ্ড গড়াইয়া আসিয়া মসী বিলেপন করিয়া দিয়া যায়, তুমিও সেইরূপ বালু সৈকতে গড়াইয়া গড়াইয়া আসিয়া, বিশ্বেতিহাসের এক এক পৃষ্ঠা মুদ্রিত করিয়া দিতেছ। কত কীর্ত্তিরেখা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, কত চিহ্ন নূতন খোদিত ও কত কলঙ্ক নূতন অঙ্কিত হইতেছে; কত জীবকঙ্কাল, কত মণিমুক্তা, কত জীবোদ্ভিদের খাদ্য দিয়া, জগতে অবস্থা ও ঘটনার বৈচিত্র্যের কারণ হইতেছ। যে সমস্ত ঘটনাবলীর সমাহারের নাম ইতিহাস, তুমিই তাহাদের প্রধান নায়ক। তুমি ভাঙ্গিতেছ, গড়িতেছ এবং সেই ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস বিশ্বগ্রন্থে লিখিয়া রাখিতেছ। মানবজাতি তাহাই দেখিতেছে, অধ্যয়ন করিতেছে এবং সেইরূপে লব্ধ জ্ঞান যখন কার্য্যে পরিণত করিতেছে, তখনই বিশ্বগ্রন্থের পৃষ্ঠাবৃদ্ধি হইতেছে। তোমারই সাক্ষাতে কাল-বালুকার উপর মহাপুরুষেরা যে সকল পদচিহ্ন বা কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই শত বিপদের মধ্যে মানবকে সুমতি দিয়া, সুপথ দেখাইয়া রক্ষা করিতেছে।

আবার আর এক কথা ভাবিতেছি। আমার চক্ষুকে তোমার উৎক্ষিপ্ত

তরঙ্গরাজির যাতায়াতের উপর নিক্ষিপ্ত রাখিয়াছি। মনে হইতেছে, নাট্যমঞ্চে দৃশ্যপট যেমন একবার পড়ে ও একবার উঠে, সংসার নাট্য-খেলায় তোমার তরঙ্গও সেইরূপ উঠিতেছে, পড়িতেছে। তরঙ্গপটের উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে বহুদৃশ্য দৃষ্ট বা অদৃষ্ট হইতেছে। কত মানব-শিশু তোমার বক্ষে খেলা করিল, কত নাচিল গাহিল, কত হাসিল কাঁদিল, কত উঠিল পড়িল, কত স্ফূর্ত্তি করিল, কীর্ত্তি রাখিল—আজ্ তাহারা কোথায়? যাহারা অসভ্য দেশে সভ্যতা দিল, আঁধার জগতে আলোক জ্বালিল, যা'দের বীর্য্যপ্রতাপে মেদিনী কাঁপিল, সে সব প্রাচীন জাতি আজ্ কোথায়? কই সে প্রাচীন ফিনিসীয় জাতি—যাহারা তিনটি মহাদেশের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের বক্ষে সপক্ষ তরণী লইয়া নানাস্থানে বাণিজ্য করিল, রাজ্যজয় করিল, উপনিবেশ স্থাপন করিল, বহুদেশের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া, বীর কীর্ত্তিতে স্বজাতির ললাটে গৌরব-তিলক পরাইয়া দিল; যাহারা রাজ্য দিত, কিন্তু স্বাধীনতা বিক্রয় করিত না; প্রাণ দিত, কিন্তু আত্মসম্মান দিত না; যাঁহাদের রমণীগণ অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিত, কিন্তু সতীত্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিত না; প্রাচীন গ্রীস যাহাদের ভয়ে কাঁপিত, সবীর্য্য রোম যাহাদের দ্বারা উৎসন্ন ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, আফ্রিকা যাহাদের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত ছিল—সে বীরের জাতি, বণিকের জাতি, স্বদেশ-প্রেমিক ফিনিসীয় জাতি আজ্ কোথায়? তুমি তাহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী যবনিকার অন্তরালে অবগুণ্ঠিত রাখিয়া দিয়াছ। আর তোমারই বক্ষে, এই বঙ্গোপসাগরে, এই ভারত-মহাসাগরে, যে ভারতীয় হিন্দুজাতি একদিন সগর্ব্বে সগৌরবে অকুতো-ভয়ে বিচরণ করিত, তাহারাই বা আজ্ কোথায়? একদিন যে বঙ্গবীরের

রণতরীসমূহ সিংহবিক্রমে সিংহলে গিয়া রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল, আজ্ তাহারা কোথায়? একদিন যে বঙ্গ-বণিকেরা বেলাপ্রান্ত তাম্রলিপ্তি হইতে বহুসংখ্যক "ডিঙ্গা" সাজাইয়া, তোমারই চলোর্ম্মিবিক্ষুব্ধ বক্ষের উপর দিয়া যব, সুমাত্রা, লম্বক, বালী প্রভৃতি দ্বীপে এবং ব্রহ্ম, চীন বা পারস্য প্রভৃতি রাজ্যে বাণিজ্য করিতে যাইতেন এবং "হরিতাল বদলে হীরা" ও "রাংতার বদলে সোণা" * আনিয়া স্বদেশের ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতেন, আজ্ তাহারা কোথায়? একদিন যাহাদের পণ্যবাহিনী কাঞ্চীতে, সিংহলে, কালিকট্টে, সৌরাষ্ট্রে, গুর্জ্জররাষ্ট্রে, অর্ম্মাজে, মোজালে, বোগদাদে, ডামস্কসে, ট্রয়ে, ভিনিসে, মার্সেলে, কার্থেজে এবং সুদূর কর্ণওয়ালে পর্য্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থিত হইত, আজ্ কি সেই বাঙ্গালীর নিকট তোমার বক্ষে আরোহণ করিয়া ভ্রমণোদ্দেশেও বিদেশে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে? যে হিন্দুর দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, শৈবধর্ম্ম তোমারই বক্ষের পথে ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মন্দিরে মন্দিরে, ব্রহ্মের মঠে, চৈনিক বিহারে, জিপাঙ্গের বেলাবাসে, এমন কি অশান্ত প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া, আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তার জন্মগ্রহণের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, সুদূর আমেরিকার পশ্চিমোপকূল পর্য্যন্ত প্রচারিত হইত, † সেই হিন্দুজাতি কি আজ কূপমণ্ডুকের মত নির্জ্জীবভাবে নিজের ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া, পরের মুখে ধর্ম্মের কাহিনী শুনিতে শুনিতে নিদ্রালস-তন্দ্রাতে ঘুমাইয়া পড়িতেছে? ঐ দেখ, যে জাতি ধর্ম্ম, ভাষা বা শিল্পকলা দিয়া, স্বদেশে ও বিদেশে কত দ্বীপোপদ্বীপের নিরক্ষর অসভ্য

* কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। † আমেরিকার কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রায়ার মহোদয় এ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন।

অধিবাসিগণকে মনুষ্যপদবাচ্য করিয়াছিল, ঐ দেখ, শুধু ধর্ম্মের খাতিরে তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য সেই প্রাচীন হিন্দুজাতির কত অসংখ্য নরনারী তোমার কূলে সমাগত হইয়াছে, এবং শাস্ত্রের নির্ব্বন্ধে তোমার ঢেউ লইবার উদ্দেশ্যে, এক জনকে দশ জনে ধরিয়া জলে লইয়া যাইতেছে কিন্তু তোমার সামান্য তরঙ্গাভিঘাতমাত্র তীরবেগে তীরে গিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সমুদ্র! নীরব থাকিও না। সত্য কথা বলিয়া আমাদের প্রাচীন স্মৃতি জাগাইবার জন্য যদি তোমাকে অনুরোধ করি, তবে তাহা রক্ষা করিতে তোমার আপত্তি কি? তোমাকে আমরা কত দেখাইয়াছি, কত শুনাইয়াছি, কত হাসাইয়াছি, কত সাজাইয়াছি, সে কথা কি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ? এ সব কারণে তুমি আমাদের নিকট ঋণী হও বা না হও, অপক্ষপাত ভাবে আমাদের প্রাচীন কাহিনী শুনাইতে তুমি ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ একান্ত বাধ্য। একবার সে অতীতের যবনিকা উত্তোলন কর, আমরা আমাদের প্রাচীন আলেখ্য দেখিয়া লই।

পয়োনিধে! তুমি অতীত কালের সাক্ষী। তুমি যে কত কাল আছ, তোমার বয়স কত, কে নির্ণয় করিবে? কিন্তু তুমি যতই বয়োবৃদ্ধ হও, কাল তোমার নীল কপালে কোন জরা-রেখা অঙ্কিত করিতে পারে নাই; তোমার উৎসাহ, উদ্দীপনা, শৈশবের খেলা, যৌবনের উদ্দাম ভাব কিছুই কমে নাই। তুমি কখনও শান্ত, কখনও কান্ত, কখনও প্রচণ্ড, আবার কখনও বা বিকটমূর্ত্তি হইয়া পড়। তোমার নাম সমুদ্র; তোমার যে কত প্রকার মুদ্রা, কত প্রকার ভাব ও ভঙ্গিমা আছে, তাহার পার নাই। সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে তুমি সর্ব্বদাই সাজ সজ্জা, হাব ভাব ও ভাবার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতেছ।

অরুণোদয়ের প্রাক্কালে যদি পবনের প্রকোপ না থাকে, তাহা হইলে, নিদ্রিত বিরাট দেহের হৃৎপিণ্ডস্পন্দনের মত, তোমার বিরাট বক্ষ হইতে শুধু গুরু গর্জ্জনই শুনিতে পাওয়া যায়। যখনই প্রাচীদ্বার দিয়া অরুণিমা ছড়াইয়া পড়ে, তখন তোমারও কপোল ও ওষ্ঠাধরে রক্তরাগ দেখা যায়। সূর্য্য উঠিলে ত কথাই নাই, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য কাচ-খণ্ডের উপর জবাফুলের মত রক্তাভা ফুটিয়া উঠে এবং ফেনিল তরঙ্গকে মণিময় করিয়া তুলে। অর্ণবযান সকল তোমার বক্ষে সুদূর প্রান্তে রাজহংসের মত প্রথম দৃষ্টিপথে পড়ে, তখন তাঁহাদের শ্বেত পক্ষ বা ধূসর ধূম্র দেখিয়াই চিনিয়া লইতে হয়; ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হওয়ার সময়, যখন তাহাদের কায়া বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বোধ হয়, তখন বড় আনন্দ হয়; যখন তাহারা পক্ষ বিস্তার করিয়া বা ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে তোমার নীল দেহের উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন ফেনপুঞ্জ যেন ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া অর্ণববিহারীদিগের কৃষ্ণকায় আলিঙ্গন করে, আর তাহারা এমন এক একটি সুন্দর শুভ্র বর্ত্ম রেখা রাখিয়া যায় যে তাহারা চলিয়া গেলেও সহসা উহার বিলয় হয় না। মানুষের জাগতিক সুখের মত, তাহারা আসে আর যায়। কত জনের আশা ভরসা, ভালবাসার পাত্র, সুখ দুঃখের সংবাদ ও সার সম্পত্তি লইয়া তরণী যে চলে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়রসে মজিয়া যাইতে হয়।

তুমি অবিরত হিন্দোলোৎসবের মত মৃদু মধুর ভাবে তরঙ্গভঙ্গে নাচিতেছ। তোমার সে নিত্যানন্দের নৃত্য দেখিতেও সুন্দর, যদি সাহস ও সাধ্য থাকে তাহার উপরে সন্তরণ দিতেও সুখকর। কিন্তু যখন গগনের কোণে কৃষ্ণমেঘ সাজায়, তখন প্রথমে তোমার মুখে কালিমার

ছায়া পড়ে এবং তোমার সাধারণ নৃত্য লীলাও কিছু মন্দীভূত হয়। তুমি কিছুক্ষণ মুখ ভার করিয়া একেবারে ধীর ভাবে বসিয়া থাক। কিন্তু এমন সময় যদি ঝড় উঠে এবং বজ্রের নির্ঘোষ আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তোমার দশা দেখে কে? অমনি তোমার রুদ্রমূর্ত্তি প্রকটিত হয়; তুমি বুক ফুলাইয়া মুখ ফুলাইয়া নাসিকাগর্জ্জন করিতে করিতে, উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া ভৈরব গর্জ্জনে উন্মত্তভাবে ভীষণ বেগে তীর ভূমির উপর আক্রমণ করিতে থাক। চলোর্ম্মি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া এমন ভাবে ফেনপুঞ্জের সৃষ্টি করে, যে তোমার দিকে চাহিলে—যত দূর চক্ষু যায়—শুধু স্তূপীকৃত তুষারশুভ্র তুলারাশি ভিন্ন কিছুই দেখা যায় না। পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালা গড়াইয়া গড়াইয়া বিপর্য্যস্ত ভাবে তীরের উপর আছাড়িয়া পড়িতে থাকে, তীরভূমি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তীরতরু কম্পিত হইতে থাকে, জীবজন্তু পলায়ন করে, আর এই সময়ে যাহারা তরণীর উপর থাকিয়া তোমার আস্ফালন সহ্য করে, তাহাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দশার কথা বলিবার নহে। এই সকল দৃশ্যের সহিত তোমার দম্ভোলির মত গম্ভীর নিনাদের যোগে এক মহাপ্রলয়ের মহাকায় মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হয়। তোমার তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান থাকে না; যে সব জলজন্তু তোমার কোলে আজীবন প্রতিপালিত হয়, তুমি তাহাদিগকে কোল ছাড়িয়া কূলে আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা কর; যে সব তরণী তোমার বক্ষে আশ্রয় লইয়া আনন্দে ভাসিয়া বেড়ায়, তুমি তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত, ভগ্ন বা একেবারে মগ্ন করিয়া ফেলিবার জন্য তোমার কোন প্রকার যত্ন বা শক্তি অপ্রকাশিত রাখ না। ক্রোধান্ধ হইলে লোক যে একেবারেই অধঃপাতে যায়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

কখন কখন দৈবক্রমে ঘূর্ণিবায়ুর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তুমি এমনই পাগল হইয়া পড় যে তোমার মর্ত্যবাসের কথা মনে থাকে না। উপরে মেঘ, নীচে তুমি, মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্ত—তিনজনে মিলিয়া মাতলামি করিতে করিতে, তুমি এমনই আত্মবিহ্বল হইয়া পড় যে নিজের বক্ষ ফুলাইয়া—ঘূর্ণাবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে, তোমার জলরাশিকে স্তম্ভের মত তুলিয়া দিয়া, যেন হস্ত বাড়াইয়া, মেঘের সহিত আলিঙ্গন কর। ঘুরিতে ঘুরিতে কুম্ভকারের চক্রের মধ্য হইতে কর্দ্দমস্তূপ যেরূপ ঊর্দ্ধদিকে উঠে, তোমা হইতে জলস্তম্ভ উঠিয়াও সেইরূপ মেঘের সহিত মিশে। তখন সেই জলস্তম্ভ পবনবেগে এমন ভীষণ মূর্ত্তিতে কখনও জল, কখনও স্থলের উপর দিয়া চলিয়া যায় যে তাহার সম্মুখে পাহাড় পর্ব্বত, বৃক্ষগুল্ম, গৃহ অট্টালিকা, জীব জন্তু যাহা কিছু পায়, সব চুরমার করিয়া উড়াইয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়। সে সময়ে তোমার দানব বলের অত্যদ্ভুত লীলা দেখিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিমূঢ় হইয়া পড়ে।

যাহাদের অন্তরে বাহিরে একই চিন্তা ও একই সাধনা না থাকে, তাহাদিগকে লোকে নিন্দা করে। সেরূপ নিন্দা তোমাকেও করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে তোমার উপরে এক রকম এবং নিম্নে অন্য রকম স্রোত প্রবাহিত হয়। পর্ব্বতের সহিত তোমার চিরকালই বিবাদ চলিতেছে। তুমি যেখানে তাহাকে নিকটে পাও, একেবারে ডুবাইতে চেষ্টা কর, একান্ত না পারিলে তাহার মূলদেশে তরঙ্গাভিঘাত দ্বারা উৎপাটিত করিবার জন্য মাথা কুটিয়া মর। সে রাগ শোধ দিবার জন্য মেরু প্রদেশে পর্ব্বত সমূহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার-শৈল সকল নিক্ষেপ করিয়া তোমাকে আঘাত করে। উহাতে তুমি আহত হও বা না

হও, তদ্দ্বারা যে প্রকারান্তরে তোমার ক্রুর প্রকৃতি সাধারণের নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তুষার-শৈল গুলি গড়াইয়া পড়িয়া তোমার জলে ভাসমান হয়। তাহাদের অধিকাংশই তোমার সলিলে মগ্ন থাকে, তাই তাহারা প্রধানতঃ তোমার নিম্ন স্তরের স্রোতে পরিচালিত হয়, সুতরাং উহারা তোমার উপরিভাগের স্রোতের বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগে বলিয়া তোমার প্রকৃতি জানিতে বাকী থাকে না। কিন্তু তুমি অতীব হিংসাপরায়ণ; যাহাকে যে ভাবে হাতে পাও, তাহা দ্বারাই তুমি আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লও। তোমার জলে স্থানে স্থানে পাহাড় গুলি ডুবাইয়া রাখিয়া উহা দ্বারা অতর্কিত ভাবে জলযান গুলির তলভেদ করিয়া ধ্বংস কর; তুষার-শৈল গুলিকে উপরের স্রোতে বিপরীত দিকে প্রধাবিত করিয়া সময় সময় তাহাদের দ্বারা জাহাজ গুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দাও। জলের সহিত অগ্নির চিরদিনই বিসম্বাদ। দুইজনে একত্র কিছুতেই থাকিতে পারে না। জলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়; অগ্নিতে জল বাষ্পীভূত হয়। কিন্তু শুনিয়াছি, তুমি নাকি তোমার গর্ভে বাড়বাগ্নি লুক্কায়িত রাখিয়াছ। সময় পাইলে সে অগ্নিও পরের অপকারার্থ নিয়োজিত করিয়া থাক। তোমার গুণ আর কত বলিব?

কিন্তু সিন্ধু হে, রাগ করিও না। তোমার সহিত আমার কিছু শত্রুতা নাই, তোমার দোষের কথা বলিবার জন্যও আমি শপথ করিয়া বসি নাই। তোমার কূলে বসিয়া তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে, তোমার বিষয়ে ক্রমানুসারে যাহা কিছু মনে আসিয়াছে, অকপট ভাবে তাহাই বলিয়াছি। যদিও তোমার প্রকৃতির প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিয়া থাকি, তোমার অপার গুণে আমি একেবারে মুগ্ধ, তোমার বিরাট

সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে আত্মজ্ঞানশূন্য। ঝটিকার সময়ে তোমার কঠোর মূর্ত্তি বিভীষিকাময়ী হইতে পারে বটে, কিন্তু ঝটিকার পরে বা অন্য সময়ে স্বভাবতঃ তোমার যে ধীর স্থির প্রশান্ত মধুর মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, তাহা দেখিলে মানুষ যেন মন্ত্রের শক্তিতে আপন হইতেই নিদ্রালস হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র মানব তোমার বিরাট সৌন্দর্য্য মাঝে ডুবিয়া হাবু ডুবু খায়, তখন তাহার অন্তর হইতে যে উচ্ছ্বাস নির্গত হয়, অতীতের স্মৃতি এবং জগতের গতির বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাহার উদ্বেলিত হৃদয় হইতে যে আবেগ ফুটিয়া বাহির হয়, তাহা বড়ই স্বাভাবিক। তখন সে তোমাকে বড় ভালবাসে, তোমাকে ভক্তি করে, তোমার প্রতি তাহার, আমার মত একটা অপূর্ব্ব আসক্তি সঞ্জাত হয়।

তোমার প্রতি আমার আসক্তির দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তোমার অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ। তোমার জলরাশি বড় লবণাক্ত; অপরিমিত জলরাশি একই গর্ভখাতে সঞ্চিত রহিয়াছে; নষ্ট না হইয়া যায়, এজন্য জগদীশ্বর উহা লবণাক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যদিও সে জলে তোমার গর্ভস্থ কোন জলজন্তুর জীবন রক্ষার সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা হয় না, তবুও সে জল অন্য কোন জীব বা উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী নহে। অথচ তোমার জলে নিখিল জগৎ বাঁচে, তুমিই জগৎকে সরস ও সজীব করিয়া রাখিয়াছ। এই জন্য তুমি তোমার অবিকৃত জল জগতে না বিলাইয়া, তাহাকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া পাঠাও; সে বাষ্পে তোমার লবণ যাইতে পারে না। তোমার কটু কষায় তোমারই থাকে; কিন্তু তোমার মেঘে যে বারিধারা বর্ষিত হয় তাহার মত স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ ও সুপেয় সলিল আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। যত সলিল যায়, সবই ফিরিয়া

তোমাতে আসে না। পৃথিবীতে বোধ হয় ক্রমেই ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় তুমিও ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ এবং তজ্জন্ত অধিকতর লবণাক্ত হইতেছ। এমন আত্মোৎসর্গ সংসার-ক্ষেত্রে সুলভ নহে ; নিজে ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া পরকে সবল ও সন্তুষ্ট করা এবং নিজের কটুভাগ নিজেই রাখিয়া, পরকে সুমিষ্ট ভাগ বহিয়া প্রদান করার এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। আত্মদানের এইরূপ অসামান্ত জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, তুমি মানব জাতির শিক্ষাগুরু হইয়াছ।

দ্বিতীয়তঃ তুমি অসাধারণ সাম্য নীতির পরিপোষক। তুমি উচ্চনীচ দেখিতে ভালবাস না ; উচ্চকে নীচ করিয়া, নীচকে উচ্চ করিয়া সর্ব্বত্র সমান করিবার চেষ্টা কর। তোমার দেহের প্রধান উপাদান জল—এবং জলের প্রধান ধর্ম্ম এই যে সে যতক্ষণ সর্ব্বত্র সমতলতা রক্ষা করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার বেগ যায় না। তুমি পর্ব্বতশীর্ষ হইতে বারিবিন্দু টানিয়া আনিয়া নিজে উচ্চ হইতে চাও, এবং চন্দ্রসূর্য্যের প্রতি আকর্ষণ বশতঃ যখন নিজে বুক ফুলাইয়া উচ্চ হইয়া উঠ, তখন যে দিকে পথ পাও, আপনার বারিরাশি অকাতরে বহাইয়া দিয়া নদনদীর দেহ ও পৃথিবীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দাও। সকল স্থানে সকল শস্য বা সকল পণ্য উৎপন্ন হয় না, অথচ শস্য বা পণ্যের অভাবে লোকে কষ্ট পায়। তাই তুমি বক্ষ পাতিয়া বসিয়া আছ, আর পণ্যতরণী দ্রব্যসম্ভারে দুর্ব্বহ হইয়া তোমার হৃৎপঞ্জরের উপর দিয়া যাতায়াত করে এবং এক স্থানের অতিরিক্ত দ্রব্যজাত আসিয়া অন্যস্থানের অভাব নিরাকৃত করে। তাই তোমার কূলে কূলে পণ্যবীথিকা, কূলে কূলে সমৃদ্ধ সহর এবং কূলে কূলে নয়নানন্দবর্দ্ধিনী রাজধানী। তুমি ধনী দরিদ্রের

প্রভেদ দেখিতে পার না। দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টের আর্ত্তনাদ শুনিয়া কাতর হও, একের ঐশ্বর্য্যে অন্যের দারিদ্র্য ঘুচাও, সাম্যনীতির বিজয় মন্ত্র উদ্গীত করিয়া জগতের সম্মুখে সম্মান লাভ কর। তোমার মত কে আছে?

তুমি রত্নাকর! অপরিমিত মণিমাণিক্য ধনরত্ন নিজের তমসাগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছ। যাহারা একবার জীবনের আশা ছাড়িয়া, যে কোন প্রকারে হউক সাহস করিয়া তোমার গর্ভে ডুব দিতে পারে, তুমি অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাদের আশা পূর্ণ কর; তাহারা যত্নের ফলে রত্নলাভ করিয়া, জীবন যাত্রা সহজ ও সুখকর করিতে পারে। কুক্ষিতলে এইরূপ ধনরত্ন লুকাইয়া রাখাও তোমার একটা প্রকৃষ্ট কৌশল। ধনীর ভাণ্ডারে অনর্থক অপরিমিত অর্থসঞ্চয় তোমার একান্ত চক্ষুঃশূল—কারণ, পরের অভাব মোচনে, ধর্ম্ম সাধনে, কিছুতেই সে অর্থ বাহির হয় না। অনাহার-ক্লিষ্ট দীন দুঃখীকে একটি পয়সা দিতেও যিনি কাতর, সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া মণিরত্ন ক্রয় করিতে তিনি লালায়িত। তাই তুমি এক অপূর্ব্ব কৌশলে রত্নরাগে নয়ন ধাঁধিয়া মন ভুলাইয়া ধনীর অর্থে পরিশ্রমীর সাহায্য কর এবং এক ক্ষেত্রের স্তূপীকৃত অর্থ আনিয়া দশস্থানে বিতরণ করিয়া দাও। তোমার কৌশল কে বুঝিবে?

আর এক কৌশলে শীতাগমে তুমি আশ্রিতজনকে রক্ষা করিয়া থাক। মেরুপ্রদেশে যখন শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তুমি তখন ক্রমশঃ জড়সড় হইতে হইতে তরল কায়া ঘনীভূত করিয়া, অবশেষে মৃত্তিকার মত কঠিন হইয়া পড়। কিন্তু তোমার সকল তনু সমভাবে কঠিন করিয়া ফেলিলে, তোমার আশ্রিত জীবজন্তুর উপায় থাকিত না।

তাই আশ্রিত বৎসল তুমি, সম্পূর্ণ কঠিন হইবার প্রাক্‌কালে প্রথমে অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া পরে এমন ভাবে একটু একটু অঙ্গ বিস্তার করিতে পার যে তোমার উপরিভাগ মাত্র কঠিন বরফে পরিণত হইয়া যায় এবং নিম্নে যথেষ্ট জল থাকে। ঐ জলে মৎস্যাদি জলজন্তুর জীবন রক্ষা করে এবং উপরে যে বহুদূর বিস্তৃত দুগ্ধফেনশুভ্র বরফরাশি বিস্তৃত হয়, তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে জীবজন্তু বিচরণ করে। বরফের আবরণে শুধু যে শীতপ্রবাহ হইতে নিম্নস্থ জলকে রক্ষা করে তাহা নহে তদ্দ্বারা জলের তাপ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তুমি এই প্রক্রিয়া দ্বারা আশ্রিতের পালন না করিলে, মেরু প্রদেশ জীবগণের বসতি স্থান হইতে পারিত না। আবার তুমি বিষুবরেখার সন্নিহিত উষ্ণমণ্ডলের কোন কোন স্থান হইতে উত্তপ্ত জলস্রোত উত্তর মুখে প্রবাহিত করিয়া দাও, তদ্দ্বারা মেরু প্রদেশের বহুস্থানের তাপবৃদ্ধি করিয়া অধিবাসিগণের জীবন রক্ষা কর। এই স্রোতকে উপসাগরীয় স্রোত বলা হয়। আজ যে ইংরাজ প্রভৃতি জাতি ভূমণ্ডলের বহুস্থানে রাজপতাকা উড্ডীন করিয়া পূর্ণ দর্পে রাজ্য শাসন করিতেছেন, তোমার ঐ উপসাগরীয় স্রোত না বহিলে তাহাদের জন্মভূমি সমৃদ্ধি ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হইত কিনা, তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে। সাধে কি বলিতে চাই, তোমার ক্ষমতা অপার, কৌশল অসীম এবং নিখিল বিশ্ব নানাভাবে তোমার নিকট ঋণী!

তোমার গুণ সমুদ্র! কত আর বলিব? তোমার গুণ ও প্রকৃতির কথা ভাবিতে ভাবিতে বেলাভূমিতে পাদচারণা করিতেছিলাম। বেলা যে ক্রমে উঠিয়াছে, নবোদিত রবি-কর-লেখায় ভুবন যে ক্রমে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা আত্মবিস্মৃত হইয়া লক্ষ্য করি নাই। তোমার প্রকৃতির

প্রসঙ্গে প্রকৃতই চিন্তা বাড়ে; কিন্তু তোমার বিরাট চিত্রপটের পানে চাহিলে, আত্মহারা হইয়া কেমন এক স্বপ্নের রাজ্যে ভ্রমণ করি। তখন চিত্ত-প্রকোষ্ঠ প্লাবিত করিয়া যে কল্পনার স্রোত বহে, তাহাতে সংসারের খুটিনাটি সব ডুবিয়া যায়; ভাসিয়া উঠে,—মানব জীবনের সারতত্ত্ব, অতীত ভবিষ্যতের কাহিনী এবং অনন্তের আভাস। দেখিতেছি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ প্রণব মন্ত্রের চন্দ্রবিন্দুর মত সূর্য্যবিন্দু ঝকমক্ করিতেছে, আর তুমি কুণ্ডলীকৃত ওকারের মত আঁকাবাঁকা ভাবে শায়িত রহিয়া তোমার গুরুমন্ত্রে—ওঙ্কারের গভীর ঝঙ্কারে, দিগন্ত মুখরিত করিতেছ। ভাবিতেছি—তোমার বক্ষে উর্ম্মিরাজির ন্যায় আমারও হৃদয়ে কত চিন্তারাজি উত্থিত ও পতিত হইতেছে—তাই ভাবিতেছি, তুমিই কারণ-সলিলের শেষ সমাধিস্থল, তুমিই মেদিনীর আদিম কারণ। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে তোমার অঙ্গ হইতে কত কি উঠিয়াছে, কত কি সৃষ্ট হইয়াছে, আবার কত কি সৃষ্ট পদার্থ তোমারই তরঙ্গভঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া, কূল প্রদেশে প্রকীর্ণ হইয়াছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? এই বিশ্ব-সংসারই তোমার খেলাভূমি; যাহা কিছু এখানে নয়ন গোচর করি, সবই তোমারই খেলার সামগ্রী হইয়া, সেই খেলা-নিলয়ের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে; শুধু করিয়াছে কেন, এখনও প্রতি মুহূর্ত্তে করিতেছে—আরও কত অনন্ত যুগ ধরিয়া করিবে, তাহা কে জানে? সৃষ্টির সকাল বেলা হইতে এই সংসার-বেলায় যে কত জীব কত জড়, কত জঙ্গম কত স্থাবর, কত অচেতন কত উদ্ভিদ, কত মৌলিক কত যৌগিক, কত বিলুপ্ত কত প্রদীপ্ত পদার্থ তোমার অতলস্পর্শ কুক্ষিতল হইতে উৎপাতিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা, শেষ বা সীমা নাই।

প্রকৃত পক্ষে তুমিই ত সৃষ্টি রক্ষা কর। তোমা হইতেই মেঘ উঠে, মেঘে বিশ্বাকাশ আবৃত করে। মেঘে বাত্যা উঠে, সমস্ত পৃথিবী আলোড়িত করে; মেঘে জল হয়, মেদিনী ভাসাইয়া দেয়। এইরূপে বায়ু ও জল আলোড়িত ও বিতরিত হইয়া সর্ব্বত্র শীতাতপ রক্ষা করে, শস্যসম্পদের উৎপত্তির কারণ হয়, জীবের জীবন রক্ষা করিয়া জীবপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে। জীবন রক্ষার উপায় হইলেই জীব থাকে, জীব হইতে শিব হয়—আনন্দ ময়ের রাজ্যে অযাচিত ভাবে মঙ্গল বিতরিত হয়। জীবন থাকিলেই ত সব হয়; সরসী-জীবনে যেমন কমলিনী ফুটে, মানব-জীবনেও তেমনি চিন্তারাজি প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং মানব জীবন যেমন আসিয়াছে, সে জীবনের ফল স্বরূপ আরও কত কি তোমা হইতে আসিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। কত ধ্যান কত ধারণা, কত চিন্তা কত প্রেরণা, কত বেদ কত বেদান্ত, কত রহস্য কত সিদ্ধান্ত, কত প্রেম কত বিরহ, কত আশা কত উৎসাহ, কত ভক্তি কত উৎসর্গ, কত মুক্তি কত নির্ব্বাণ, কত জ্ঞান কত ভাষা, কত স্নেহ কত ভালবাসা, কত সৃষ্টি কত বিলয়, কত বিপ্লব কত প্রলয়—সকলই তোমা হইতে উঠিয়াছে, সকলই মানবিক চিন্তার ফল। জগতে যাহা কিছু জ্ঞানের বিকাশ, সঞ্চয় বা পরিচয় দেখিতে পাই—সকলই সেই চিন্তা-প্রসূত। জীব যখন জড়ত্ব ছাড়িয়া দেবত্ব পাইতে চায়, স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মে যাইতে চায়, উন্নতির মার্গে উড্ডীন হয়, তখন তাহার মনে স্বতঃই যে সব চিন্তা, আবেগ, কল্পনা ও সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়, তাহাই ত মানবের জ্ঞান সমষ্টি, তাহাই মানবের জীবন-বৃত্তের উপাদান, তাহাই মানবের সমাজ বা ধর্ম্ম সংস্কারের মূলভিত্তি। স্তরে স্তরে পরীক্ষা করিয়া মূলানুসন্ধান করিলে, এসকলই আবার তোমা

হইতে আসিয়াছে। তোমা হইতে মেদিনী, মেদিনীর কোলে মানব, মানবের ফলে চিন্তা ও জ্ঞান; আবার মেদিনীর বক্ষে পর্ব্বত, পর্ব্বত শিখরে তরুলতা, তরুলতায় ফুল ও ফল;—সকলই তোমার শক্তি ও সত্ত্বের ক্রমিক ফল।

তোমাহইতেই যেরূপ সব আসিয়াছে, আবার তোমাতেই সব বিলীন হইবে। তুমিই বাষ্পীভূত হইয়া মেঘ হও, তাহারই বর্ষণ-সলিলে সরিতের সৃষ্টি হয়, ক্ষুদ্র সরিৎ গিয়া সলীল নদনদীতে পরিণত হয়, অবশেষে তাহারা তোমাতেই গিয়া আত্মোৎসর্গ করে। তুমিই উঠিতেছ পড়িতেছ, তুমিই তোমাতে মিলিতেছ; মিশিবার পথে প্রকৃতির রাজত্ব খুলিয়া অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত পরিবর্ত্তন, এবং অনন্ত সৌন্দর্য্যের কারণ হইয়া আসিতেছ। বিশ্ব মাঝে জীব বা উদ্ভিদ মরিতেছে, তাহাদের ভূতদেহ ভূতে মিশাইতেছে, পৃথ্বীতনু সেই ভূতের সমাধিস্থল; আবার তোমার দেহে বিলীন হইবার জন্য তাহার আবেগ এতই অধিক যে তটিনী যখন তোমার পানে ধায়, তখন তটভূমি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, তটিনীর চূর্ণ কুন্তল ধরিয়া গিয়া তোমার গর্ভে অদৃশ্য হয়। কিন্তু অদৃষ্ট হইয়া কি থাকিবার উপায় আছে? তুমি আবার অদৃশ্যকে দৃশ্য কর, ভাঙ্গিয়া গঠন কর, দ্বীপরূপে নূতন জগৎ সৃষ্টি কর! কখনও কখনও তোমার উদরে তোমারই স্বেদজ যে সকল জন্তুর উদ্ভব হয়, তাহাদেরই অস্থিপঞ্জর আবার দ্বীপাকারে শৈলাকারে দেখা দেয়। এক নূতন দৃশ্যপট উন্মুক্ত হয়, এক নূতন সংসার খুলে, কত জীবোদ্ভিদের সৃষ্টি-প্রবাহে অবশেষে হয়তঃ সৌধ-কিরীটিনী জন-সংঘময়ী নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সে সকলই তোমার খেলা, যেমনই তোমার লীলাভঙ্গিতে তাহার উদয়, তেমনই

তোমার ক্রীড়া কটাক্ষে তাহার বিলয় ও বিস্ময়ের বিষয় নহে। "যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে", তেমনই জলবুদ্বুদতুল্য কত সৃষ্টিলীলাই তুমি প্রকটিত করিতেছ, আবার সব লীলা তোমাতেই শেষ হইতেছে। তুমি বিশ্বের আদি, তুমি বিশ্বের মধ্যলীলার কারণ, তুমিই বিশ্বের শেষ। তোমার মহিমার পার নাই, কার্য্যের অন্ত নাই, শক্তির শেষ নাই। একবার সে শক্তির কণা মাত্র দাও, আমার ক্ষুদ্র জীবনকণা ধন্য হউক।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তুমি অনন্তের পরিদৃশ্যমান আদর্শ। তোমার কূলে বসিয়া, তোমার উন্মুক্ত হৃদয়ের পানে চাহিলে নয়ন কতদূর ছুটিয়া যায়—কূল নাই—পার নাই—শেষ নাই—শুধুই কেবল ধূ ধূ করিতেছে; অতিদূরে আকাশ যেন নামিয়া আসিয়া, তোমার চরণ চুম্বন করিতেছে—কারণ তাহার সার সম্পত্তি মেঘ তোমারই বলিয়া সে তোমার নিকট কত ঋণী! তোমার ফেনাম্বরে যেখানে শ্বেতাম্বর মিশিয়াছে, সেখানে উভয়কে পৃথক্ করিয়া চিনিতে পারা যায় না। জলাকার, মেঘাকার, সব যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও সেই একাকারই দেখিতে পাওয়া যায়। নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মন ছুটে, সেও যে কতদূর চলিয়া যায়, ভাবিয়া পাই না। ভাবিলে নিজের সত্তাও বিলুপ্ত হয়। আমাতে আমি থাকি না। অনন্তের অংশ যেন অনন্তে মিশিয়া যাইতে চায়।

কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকি। বুঝি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না, যে ইহাই অনন্তের আভাস। বুঝাইতে পারিলে ত অনন্ত সান্ত হইয়া যাইত। ভাবি, জ্ঞানের নেত্রে কতকটা দেখিতে পাইয়া, ভাবি—

তুমি অনন্তরূপে বিরাজ করিতেছ। এ পাশেও তুমি, ও পাশেও তুমি। মধ্যে একটি স্বল্পবিস্তৃত, আঁকাবাঁকা, উচ্চনীচ পৃথ্বীখণ্ড—উহাই মানব জীবন। মানব-শিশু তোমা হইতে উঠে—তোমার বেলাভূমিতে বালুর খেলা খেলে; ক্রমে তাহার জীবনের বেলা যত বাড়ে, তত সে তটের দিকে অগ্রসর হয়। তাহার সেই জীবনের গতি যে কত ঘুরিয়া ফিরিয়া, উঠিয়া পড়িয়া, চলিয়া যায়—জীবনের যাহা কিছু লীলা—শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম্মকর্ম্ম, হাসি কান্না—সব শেষ করিয়া, শেষে সে আবার তোমার কূলে বসে এবং সর্ব্বশেষে শেষ শয্যায় অনন্তকায়ে মিশাইয়া যায়। সিন্ধু হে, কবে সে দিন আসিবে? তোমার বেলায় পাদচারণা করিতে করিতে আমার বেলা ত ফুরাইয়া আসিয়াছে। যে দিন বেলা ডুবিবে, সে দিন কি তোমার বক্ষে ডুবিতে দিবে? তুমি যাঁহার গুণ গাও, যাঁহার পানে যাও, ও যাঁহার চরণ চাও, এ দীনহীন কি শেষের সে দিনে সে চারু চরণে আশ্রয় পাইবে? সাধুসঙ্গের মত সহায় নাই; তুমি কি এ সঙ্গ-হীনের সহায় হইবে? তোমার কূলে বসিয়া অবিরতই শুধু মনে হইতেছে, আমার গতি কি হইবে?



মা! তুমি কোথায়?

মা! তুমি কোথায়? আমার স্নেহের ধন, আদরের সামগ্রী, আশা ভরসার প্রিয়বস্তু, তুমি কোথায়? আমার সংসার মন্দির ছাড়িয়া, স্নেহের কোল ত্যজিয়া, আনন্দতীর্থ পরিত্যাগ করিয়া তুমি মা! গিয়াছ কোথায়? তোমার স্থূল দেহ অকূল সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে, তোমার জীবনবায়ু অবায়ব ব্যোমবর্ত্মে উড়িয়া গিয়াছে, সূক্ষ্মশরীর অন্নময়কোষ ছাড়িয়া কোষাধ্যক্ষের কক্ষপানে ছুটিয়াছে; আছে শুধু তোমার আনন্দবর্দ্ধিনী মূর্ত্তির নিরানন্দময়ী স্মৃতি, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র জীবনের সংক্ষিপ্ত নাট্য-রঙ্গের ছিন্ন ভিন্ন দীন চিন্তাবলী। তাই তোমাকে মনে পড়ে, মনে তোমার বিবিধ ভঙ্গির বিভিন্ন প্রতিমা গড়ে; কিন্তু সে যে কল্পনানেত্রে প্রতিফলিত প্রতিকৃতি; প্রকৃত তুমি মা! কোথায়?

তুমি যে আমার কি যত্নের নিধান, সোহাগের স্থান ছিলে, তাহা তুমি বুঝিবে না। তরুশাখে পাখী গায়; তাহার মধুমাখা কাকলীতে কত দগ্ধ হৃদয়ে যে মধু বর্ষণ করে, সে তাহা জানে না। শিখাবল পাখা খুলিয়া নাচে, নর্ত্তন তাহার ব্যবসায়; তাহার সুবঙ্কিম সমুজ্জ্বল উন্মুক্ত-পুচ্ছের চন্দ্রকরাশি যে কত দর্শকের প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করে, সে তাহা বুঝে না। অগ্নির দাহিকা-শক্তির মত বিহগের কূজন ও ময়ূরের নর্ত্তনই তাহাদের ধর্ম্ম। সেই নিত্যধর্ম্ম পালন করিয়া তাহারা সুখী। তুমিও নবনীতনিন্দী সুঠাম দেহসৌকুমার্য্যে, অমৃতনিঃস্যন্দী বচন-মাধুর্য্যে আত্মীয়-স্বজন-শত্রু-মিত্রে বিমুগ্ধ করিতে সক্ষম ছিলে, কিন্তু তোমার সে মোহিনীশক্তির মূল প্রস্রবণ কোথায়, তাহা তোমার পরিজ্ঞাত ছিল না।

মা ! তোমার বালোচিত সহজ সরল বুদ্ধিতে যে আত্মসিদ্ধি করিয়া লইয়াছিলে, তাহা শিশু-সম্প্রদায়ে সুলভ নহে। তোমার মত এক দুর্লভ পদার্থ হারাইয়া আমি অপদার্থের মত অনর্থক অনুসন্ধান করিতেছি—মা, তুমি কোথায় ?

যখন তখন দণ্ডে দণ্ডে তোমার কথা মনে পড়ে ; মন উভরড়ে তোমার পানে ধায় ; তোমার চিন্তায় চিত্ত উন্মত্ত হয় ; চিন্তায় চিন্তা বাড়ে। সঙ্গে কেহ থাকিলে তোমার কথায় কথা বাড়ে ; জানি, তোমার কথা বলিতে আমার যত সাধ, যত সুখ. তোমার কথা শুনিতে অন্যের তত স্পৃহা থাকে না। বন্ধুর সাগ্রহবাক্যে যতটুকু কর্ণপাত করা সম্ভব, অন্যে তাহাই করেন। তোমাকে ভাল বাসিয়া যে সুখ ছিল, এখন তোমার কথা বলিয়া সেই সুখ ভোগ করি। মানুষমাত্রেই সুখের দাস, সুখের জন্য লালায়িত। মানুষ স্বেচ্ছায় যাহা কিছু করে, সে সব সুখের লাগিয়া। ক্রন্দনে সুখ না থাকিলে মানুষে কাঁদিত না, দীর্ঘশ্বাসে আশ্বস্ত না হইলে মানুষে "হা হুতাশ" করিত না, আমি তোমার কথা ভাবি, কারণ ভাবিয়া সুখ আছে। আমি যখন তখন ভাবি, তুমি এখন কোথায় ?

একবার ভাবি, তোমার ভব-কারাবাসকাল নিঃশেষ প্রায় হইয়াছিল; কর্ম্মফলের যে স্বল্পকাল ভোগাবশেষ ছিল, মুক্তিলাভের যে সামান্য সময় অবশিষ্ট ছিল, তাহাই তুমি অবিশিষ্টভাবে আমার কুটীরে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছ ;—রোগমুক্ত-শরীরে, হাস্যদীপ্ত-বদনে, অপাপবিদ্ধ-জীবনে সিদ্ধপুরুষের মত অতিবাহিত করিয়াছ—সর্ব্বদা তোমার সরল সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে, কোন উন্নঃস্তরের ঊর্দ্ধমুখী আত্মার প্রকাশ-

দেহ বলিয়া বোধ হইত। আজ্ তাই মনোমধ্যে তোমার অনুসন্ধান করিতে করিতে ভাবিতেছি মা, মনোমোহিনি! তুমি কোন্ মনোময়-লোকে ভূমানন্দে বাস করিতেছ। বাস কর, সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর, আমাদের মত হতভাগ্যের কথা ভুলিয়া, মর্ত্তের জীবনযজ্ঞে আহুতি দিয়া, নিরুদ্বেগে পরম প্রেমাবেশে বাস কর। নয়ন্ মেলিয়া যদি অত দূরের ছবি না দেখিতে পারি, নয়ন মুদিয়াও কি দেখিতে পাইব না? আমার পাপতমসা ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; নয়ন নিমীলিত করিলেই দেখি ঘোর অন্ধকার; কেশকৃষ্ণ, সূচীভেদ্য অনন্ত-বিস্তৃত, নিবিড় তমসারাশি। অনন্ত জলধিবক্ষে বাত্যাতাড়িত মানবের মত সে আঁধার সাগরে আমি হাবুডুবু—খাই, আর ভাবি, মা, তুমি কোথায়?

তুমি প্রিয়বস্তু; তোমাকে দেখিতে পাই না; সুতরাং তোমাকে হারাইয়াছি। প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদের জন্য বিষাদের নাম শোক। শোকের দুইটি চিহ্ন—দীর্ঘশ্বাস ও নেত্রাশ্রু। তোমাকে হারাইয়া আমি শোকগ্রস্ত বটে, কিন্তু আমার বেলায় শোকের চিহ্ন নাই বলিলেই হয়। আমি দীর্ঘশ্বাস ক্বচিৎ ত্যাগ করি; তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্বাস প্রশ্বাস সময় সময় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হয়; সময় সময় যখন নির্জ্জনে নিজমনে তোমার সম্বন্ধ লইয়া অনন্যমনা হইয়া বসিয়া থাকি, ভগবান ব্যতীত আমার অস্তিত্বের কথা অন্যে কেহ জানে না। আর নেত্রজল—ভগবান তাহাতেও আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। সুরধুনীর পবিত্রধারার মত নয়নের পবিত্র ধারায় মানবের পাপমলীমস-চিত্ত বিধৌত হইয়া যায়, সংরুদ্ধ কণ্ঠশ্বাস বিমুক্ত হয়, সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের সঞ্চিত শোকরাশি বিলীন হয়। যে সলিল সংস্পর্শে শুষ্ক পাষাণ-হৃদয় স্নিগ্ধ ও সরস হয়, আমি

তাহাতে বঞ্চিত। অন্যে যাহাকে শোক বলে, আমার তাহা আছে কি না, জানি না।

আমার আছে দুশ্চিন্তা। বিষাদের মেঘমালা হৃদয়াকাশ পরিব্যাপ্ত করিতে যায় বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তার পবনে তাহা ছিন্ন ভিন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। সে নিবিড় নীরদজাল সঞ্চিত, সজ্জিত বা ঘনীভূত হইতে পারে না। সে মেঘে বর্ষণ নাই, সে ধারাধরে ধারা নাই। তাহার একটী কারণ আমার শত দুশ্চিন্তা, তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে তোমার খেলনা, তোমার অশন শয়ন, বসন ভূষণ কত কথা ভাবি—সংসারের খুটি নাটি হইতে মানব জীবনের আদর্শটি পর্য্যন্ত ভাবিয়া বসি, নির্ঝর সরিৎ নদনদী দিয়া সাগরে পড়ি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবিয়া বসি। যেদিন প্রকৃত ইহাই হইবে, সেদিন ধন্য হইব। তোমাকে হারাইয়া যদি জগত সংসার পাই, তোমাকে ভুলিয়া যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্মৃতি জাগে, তবে আর কিছু চাই না "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু"—জগতের স্ত্রীমূর্ত্তিনিচয় জগদ্ধাত্রীরই বিভিন্ন অংশ। মা, তুমিও সেই মা আদ্যাশক্তির ছায়া। সে মায়ের ছায়ায় জগৎ গঠিত, তোমার শক্তির ছায়াও জগতে পতিত। যতক্ষণ সূর্য্যদেব থাকেন, কোন বৃক্ষাদিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার ছায়া পড়ে ; সূর্য্য যতদূরে যান, ছায়া তত দীর্ঘ হয়। যখন সূর্য্য অস্তমিত হন, তখন ছায়ায় ছায়ায় একাকার হইয়া যায়, বহুছায়া মিলিত ও ঘনীভূত হইয়া রজনীর ঘনান্ধকারের সৃষ্টি করে। আমার সুখসূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমার যে এক ছায়া ছিল, আজ্ তাহা নাই। আমার সুখসূর্য্য বিলুপ্ত, তোমার মায়াডোর বিচ্ছিন্ন। তাই বহুধা বিক্ষিপ্ত হইয়া তোমার সে ছায়া বহুছায়ায় মিশিয়া গিয়াছে। বিশ্বজননীর যে

মধুর ছায়া তোমাতে কায়া পরিগ্রহ করিয়াছিল, তোমার কায়ার নাশে সে ছায়া সংসারক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে। আজ তাই খুজিয়া পাইতেছি না,—মা, তুমি কোথায় ?

যখন শিশুর হাসি দেখি, তখন ভাবিয়া পাই না—কোথায় আমার হাসি রাখি। ভুলিয়া গিয়া ভাবি সে তোমারই হাসিরাশি ; অমনি আনন্দসলিলে ভাসি, আর তোমার মত তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিতে প্রত্যাশী হই। বালিকা যখন রাঙ্গা গায়ে কাল চুল দুলাইয়া, খঞ্জন-নয়নে অঞ্জন মাখিয়া, চঞ্চলগমনে অঞ্চল নাচাইয়া, মুখ খুলিয়া মুক্তাপংক্তি দেখাইতে দেখাইতে ছুটে, তখন তাহার নবনীতাঙ্গের তটে তটে তোমারই মাধুরীলীলা প্রকটিত হয়। তখন তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকি, কোলে তুলিয়া আঁখি ভরিয়া দেখি, অকারণে কত কথা বলি, সে চারু-করে মিষ্ট দিয়া হৃষ্টচিত্ত হই—ভাবি না, তুমি ত জগতে নাই। যখন কোন ভাগ্যবানের গৃহে লক্ষ্মীরমণীর পাদচারণা দেখি, তখন ভাবি আমার মাকে অনেক দিন দেখি নাই ; মা বুঝি আমাকে ফাকি দিয়া পৌরবধূবেশে পরের গৃহ উজ্জল করিতে আসিয়াছে। আবার যখন পরিণতবৃক্ষে পক্ক ফলের মত, প্রভাময় পূর্ব্বাকাশে সৌরচিত্রের মত, মায়ের বক্ষে শিশুর ছবি দেখি, তখন বুঝিয়া পাই না আমার মাতৃমূর্ত্তি কোথায়—সেই পূর্ণযৌবনা রমণীর ধীর গম্ভীর জননী-মূর্ত্তিতে, না সেই কার্ত্তিকেয়োপম শিশুকায়ার পুষ্পলীলায় ; ভাবি—আমার ভ্রমকে ধিক্কার দিয়া, হয়ত আমার মায়ের আয়ুর্ব্বৃদ্ধির সঙ্গে পরিণত বয়সের পূর্ণপ্রতিমা পরিদৃষ্ট হইতেছে—অথবা দেহান্তের পর নবজীবন পাইয়া, কোথাও বক্ষশূন্য করিয়া অন্যত্র বক্ষ পূর্ণ করিবার আশায় এই লক্ষ্মীর নিলয়ে

মায়ের ছায়া আবির্ভূত হইয়াছে। এইরূপে নানা ভাবে নানা স্থানে, বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন অবস্থায় মানবী কায়ায় তোমার অস্তিত্বের কল্পনা করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জানি না মা, তুমি কোথায় ?

তোমার দেহান্ত হইয়াছে। তোমার দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া প্রাণপাখী পলায়ন করিয়াছে অথবা দেহ-কারাগার ত্যাগ করিয়া দেহী আত্মা দেহান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য চলিয়া গিয়াছে। যন্ত্রীর অভাবে শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রনিচয় বিকল হওয়ায় দেহের ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে। এ জগতে কিছুই কোন অবস্থায় স্থির থাকে না। উন্নতি বন্ধ হইলে অবনতি অবশ্যম্ভাবী ; ঊর্দ্ধমুখী লোষ্ট্রের গতি নিবৃত্ত হইলে সে অধোমুখে পতনশীল হইতে বাধ্য। যন্ত্র বিকল হইলে অবিকল পূর্ব্বাবস্থায় না থাকিয়া—মরিচা পড়িয়া ক্ষয়িত হইতে থাকে। দেহ-যন্ত্রেরও সঞ্চালনশক্তি রহিত হইলে, তাহার বিশ্লেষণ ক্রিয়া আরব্ধ হয়। তাই তোমার পঞ্চ-ভূতোদ্ভূত ভূতদেহ বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনরায় পঞ্চভূতে মিশিয়াছে। তোমার ক্ষুদ্র দেহের অণু পরমাণু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট দেহে বিলীন হইয়া পদার্থের অবিনশ্বরত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে। তুমি কোথায় আছ, কোথায় নাই—তাহা বুঝিয়া পাই না। বৃথা অনুসন্ধান করি—মা, তুমি কোথায় ?

এখন উপায় কি ? তোমাকে ভালবাসিতাম—স্নেহ করিতাম—অপক্ষপাতভাবে বলিতে গেলে, বলিতে হয়—তোমার প্রতি পক্ষপাতী ছিলাম। আর "ছিলাম" কেন ? এখনও আছি—আমার সহিত এ নরদেহের যত দিন সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন থাকিব। আর "ততদিনই" বা কেন ? তুমি বিশ্ববিধাতার দেহোদ্ভূত দেহাংশ ; সে দেহাংশ ব্যতীত

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্ত কিছু নাই। তোমার প্রতি পক্ষপাতিতা আর পতিতপাবন ভুবনেশ্বরের প্রতি পক্ষপাতিতা একই কথা। সূর্য্যরশ্মিতে অগ্নিকণা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, কাচখণ্ড তাহাই সংগ্রহ করিয়া অনলের সৃষ্টি করে। অগ্নিকণার অস্তিত্ব নিত্য; কাচ অনিত্য অবলম্বন মাত্র। কিন্তু নিত্যের জন্য সেই অনিত্যই অবলম্ব্য হয়। কাহার জন্য তোমাকে ভালবাসি, তাহা কি তুমি জান না? মা তোমার সুকুমার দেহ যেরূপ বিশ্বজগতে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া বিলীন হইয়াছে, আমার ভালবাসাও সেইরূপ বিশ্ব-সংসারে প্রসারিত করিয়া দিব। যেখানে থাকিবে—দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতের আর্ত্তনাদ, ক্ষুধাক্লিষ্টের মহাবিষাদ, যেখানে দেখিব—শোকাচ্ছন্নের উন্মত্ততা, তৃষ্ণাতুরের কাতরতা, যেখানে শুনিব রোগক্লিষ্টের করুণ ক্রন্দন, বিষদষ্টের দারুণ বেদন—সেই স্থানই তোমারই তৃপ্তির উদ্দেশে আমার ক্ষুদ্রদেহের ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র মনের ক্ষীণবৃত্তি পরসেবায় নিয়োজিত করিব। পরের বেদনাকে আত্মবেদনা মনে করিয়া বিশ্বচরণে আত্মবলি দিব। আমাছাড়া বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে, তাহাদের সকলের কৃপায় যদি আমার এ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তবে আমি—আমি—আমি, আমার আমিত্ব মা, তোমাতে পরিণত করিয়া দিব।



মা! তুমি যাইতেছ কোথায়?

[স্নেহময়ী জননীর মৃত্যুপলক্ষে।]

এ কি দৃশ্য মা! তোমার বাগিন্দ্রিয় সংরুদ্ধ, নেত্র-পদ্ম অর্দ্ধ-নিমীলিত, দেহযন্ত্র প্রায় স্পন্দন হীন; তুমি যাইতেছ কোথায়? সম্ভাষণের উত্তর নাই, করুণার কটাক্ষ নাই, আভাসেও মনোভিলাষের বিকাশ নাই; তোমার সাধের সংসার, স্নেহের সন্তান ও আশার সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, সব ফেলিয়া, শবপ্রায় হইয়া, মা আমার, জননি আমার, তুমি যাইতেছ কোথায়? তোমার যত্নের গৃহধর্ম্ম কে পালিবে, তোমার স্নেহের মূলমর্ম্ম কে বুঝিবে, তোমার সংসারের গুরু-কর্ম্ম কে আর করিবে? মাগো, একটা প্রকাণ্ড সংসারের আনন্দোৎসব বন্ধ করিয়া, গৃহস্থের সব কার্য্য বিশৃঙ্খল করিয়া, নিজের শারীর-যন্ত্রকে বিকল করিয়া, এই কি তোমার যাওয়ার সময়? তোমার স্নেহের পুত্তলীগণ কাঁদিয়া আকুল, তোমার কুলবধূগণ ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিয়া ব্যাকুল, তোমার প্রতিবেশিগণ সকলই তোমার যাওয়ার পক্ষে ঘোর প্রতিকূল; এখন কি তোমার যাওয়া উচিত? তোমার অনেক আরব্ধ কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে, সংকল্পিত কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, এবং আশার কার্য্য এখনও সংকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; এই কি তোমার যাওয়ার সময়? তোমার সংসার-মন্দিরের পতিদেবতা এখনও কঙ্কাল-শরীরে মৃত্যুর শয্যায় মুহ্যমান, তোমার পুত্রগণ এখনও সকলে জীবিকার্জ্জনে ক্ষমবান নহে, তোমার কন্যাবৎ সংপোষিত বধূগণ এখনও সংসার রক্ষণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা;

এই কি তোমার যাওয়ার সময় ? সন্ধ্যা সমাগতা, আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, রজনী বিঘোরতমসাময়ী ;" এই কি তোমার যাওয়ার সময় ?

মনে হইতেছে, তুমি যেন সময় অসময় না মানিয়া, এ দেশ পরিত্যাগ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। তোমার ভব-লীলার সমাপ্তিকাল সমাগত। তোমার ইন্দ্রিয় সমূহ অবশ, দেহ অসাড়, এবং বাক্‌শক্তি ক্রমে একেবারেই রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে ; শ্বাসকৃচ্ছের জন্য অস্থিপঞ্জর যেন ধ্বসিয়া যাইতেছে। কত "মা, মা" করিয়া ডাকিতেছি, কিন্তু সে চিরনূতন, সস্নেহ, শশব্যস্ত সদুত্তর আর নাই। বাল্যজীবনে একযুগ ধরিয়া তোমার অশ্রান্ত অযাচিত স্তন্যপীযূষে আমার দেহযষ্টি সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল ; আজ দুঃখের কথা বলিব কি, বহু চেষ্টা করিয়াও কবলমাত্র গো-স্তন্যে তোমার কণ্ঠশোষ নিবারণ করিতে পারিলাম না। কারণ তোমার জীবন-প্রদীপ ক্রমেই নিস্তেজ ও নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়া আসিতেছে ; অন্তিমকাল সন্নিহিত দেখিয়া, মা তুমি অন্তিমের সম্বল দুর্গানাম জপ করিতে চেষ্টা করিতেছ ; প্রণাম করিবার জন্য শতবার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মস্তক স্পর্শ করিবার উদ্যোগ করিতেছ ; কিন্তু হায় ! দেহযন্ত্র যে সর্ব্ব প্রত্যঙ্গে শক্তিহীন, স্পন্দনহীন হইয়া পড়িতেছে, তুমি কিছুতেই তাহা পারিতেছ না ! সকলে তোমার অন্ত্য-ক্রিয়ার জন্য উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমার কি উপায় হইবে মা ! প্রকৃতির গায়ে যেরূপ ঘনান্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, আমিও মা পলকে চক্ষে সেইরূপ অন্ধকার দেখিতেছি। দেখিতেছি, তোমার বদনমণ্ডলে কালের নিবিড় ছায়া, আর আমার ভবিষ্যৎ এক ঘোর তমসাজালের কুক্ষিতলে নিমজ্জিত।

সম্মুখে অন্ধকার, পশ্চাতে অন্ধকার, চারিধার ঘেরিয়া মানবজীবনের

মায়ামোহময় ঘোর অন্ধকার। এ অন্ধকারের প্রারম্ভ নাই—শেষ নাই ; আছে শুধু অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন সূচীভেদ্য নিবিড় তমসাজালের অনন্ত ব্যাপকতা। এই কি মানব জীবন ?

"মানব-জীবন যেন চপলা চমক
এই আছে, এই নাই, ফিরে না চাহিতে পাই,
কাল-নভস্তলে অগ্নি মিশায় ঝলক ;
দু'দিন আঁধারে থাকি, আঁধারে স্থিরিতি রাখি,
অনন্ত আঁধারে গিয়া মিশাই আবার,
আঁধারের জীব করি আঁধারে বিহার।" *

মা ! আমাকে আঁধারে ফেলিয়া, আমার গৃহধর্ম্ম আঁধারময় করিয়া, তুমি কোন্ আঁধারে বিলীন হইবার জন্য যাইতেছ ? যাহারা আঁধারের মধ্যে আলোক দেখিতে পায় না, তাহারা আঁধারের মধ্যেও আঁধার খুঁজে এবং আরও মস্তক গুঁজিয়া চক্ষু বুজিয়া আঁধারের অন্তস্তলে আঁধারেরই মত ডুবিয়া থাকিতে চায় ; আর যাহারা ভাগ্যবশে আঁধারের-মধ্যে আলোক দেখে, তাহারা সকল মায়া ত্যজিয়া, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া আত্ম-বিহ্বল হইয়া আলোকের পানে ছুটে ; তুমিও সেইরূপ ছুটিয়াছ ; এবং সম্মুখের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া তুমি যে পশ্চাতে ঘনান্ধকারের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছ, এবং তুমি যতই আলোকের নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই যে সেই ধান্তরাশির বিরাট বিস্তৃতি আরও বাড়িবে, সে কথা তুমি ভাবিতেছ না। আজ যদি মা ! কোলের ছেলে কোলে করিয়া ছুটিতে,

* লেখকের স্বরচিত "মানব-জীবন" নামক কবিতা হইতে গৃহীত।

তাহা হইলে কি তার এই দুর্দ্দশা হয়? তাহা হইলে কি জিজ্ঞাসা করিতাম, মা! তুমি যাইতেছ কোথায়?

আবদ্ধ বিহঙ্গ যেমন সুযোগ পাইলেই পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া, শূন্য পানে ছুটে, আত্মাও সেইরূপ দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিতে পারিলে, অনন্ত শূন্যে মিশায়। বাল্য হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ় হইতে বার্দ্ধক্য যেরূপ অবস্থান্তর মাত্র, মৃত্যুর পরে দেহান্তর লাভ ও সেই রূপ অবস্থান্তর ভিন্ন কিছু নহে। তোমার আত্মাও বুঝি সেই জন্য মহা ব্যাকুল হইয়াছে। অন্নগত দেহকে অন্নময় কোষ বলা হয়; দেহান্তে উন্নতি-পথারূঢ় আত্মা উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর স্তরে যাইতে যাইতে ক্রমে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ পার হইয়া, আনন্দময় কোষে সচ্চিদানন্দের আনন্দ রসে আত্মহারা হইয়া বসে। সেই ভূমানন্দ লাভ হইলেই, সাযুজ্য মিলে, নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। আমার মত মূর্খত্ব-গর্ব্বিতের নিকট এই শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ, উন্মীলিত-নেত্র মনীষিগণের ভূয়োদর্শনের ফলস্বরূপ আপ্তবাক্য, চিরদিনই দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গেল। মৃত্যুর পারে আত্মার গতি কোন্ পথে হয়, আমি অবোধ তাহার কি বুঝিব? কেহ সশরীরে যে পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পথের খবর দেয় না, * সে দুরধিগম্য পথের পরিচয় কেমন করিয়া পাইব? কিন্তু কথা এই, এ জীবনের কার্য্য-ফলে সে পথ কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা জানিতে গিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াই বা ফল কি? তবে মা! তোমাকে ছাড়িতে গিয়া পিপাসুনেত্রে পথের পানে চাহিয়া আছি। তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, এই

* "The undiscovered country from whose bourn
No traveller returns"—*Shakespeare.*

তোমার সন্ধানে ছুটিতে বাসনা হয়। কিন্তু করাল মূর্ত্তিতে সদণ্ড কাল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান; আমার কাল পূর্ণ না হইলে অগ্রসর হইতে দিবে না। তাই দূরে থাকিয়া বড় তৃষিত প্রাণে ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছি, মা! তুমি যাইতেছ কোথায়।

এমন ভক্তির বন্ধন, এমন আকুল ক্রন্দন, এমন শান্তির সদন পরিত্যাগ করিয়া মা, তুমি যাইবে কোথায়? শুনিতে পাই, পুণ্যের ফলে দেহ-নিক্রান্ত আত্মা স্বর্গলোক চন্দ্রলোক প্রভৃতি কত সুখশান্তিময় আনন্দধামে প্রস্থান করে। তোমারও সেইরূপ কোন লোকান্তর প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু জননি! সে লোকে কি কেহ এমনই করিয়া তোমাকে "মা" বলিয়া ডাকিবে? সে দেশে লোকে কি এমনই করিয়া তোমার অভাব বুঝিবে? তোমার স্বভাব কি সে দেশে এমনই করিয়া পূজিবে? তুমি যে লোকেই যাওনা কেন, তোমার দেবতুল্য প্রকৃতির পূজা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের মত যাহারা তোমার দেবভাবে মোহিত হইয়াছে, তোমার অপার স্নেহের সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, তোমার অযাচিত অফুরন্ত অনুকম্পায় আত্ম-বিহ্বল হইয়া গিয়াছে, তাহারা যেমন করিয়া তোমার পূজা করিত, তোমার পানে ছুটিত, তোমার পায়ে লুটিত, তেমন করিয়া—তোমার স্নেহের অপরিশোধ্য মধুময় ঋণজালে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে—তেমন করিয়া কি সে দেশের লোকে তোমার কর্ম্ম, তোমার মর্ম্ম বুঝিবে? বলিতে পার, মা! অমৃতের আদর স্বভাবসিদ্ধ; সে কাহারও আদর চায় না, অথচ আদর পায় না, এমনও হয় না। সে কথা সত্য; তাহা বুঝি। কিন্তু তবুও যে অমৃতের আস্বাদন পাইয়াছে, সে কি তাহা ছাড়িতে

পারে? তাই বলি মা! এ দীনহীন অধম সন্তানকে ছাড়িয়া যাইও না। তোমার সে গন্তব্য লোকে সুষমার অপূর্ব্ব বিকাশ, শান্তির অপূর্ব্ব লীলা, সুখের অপূর্ব্ব খেলা থাকিতে পারে; কিন্তু তুমি একাকী চলিয়া গিয়া সে দেশে যে অপরিমিত শান্তিসুখ লাভ করিবে, এ দেশে আমাদের ততোধিক শান্তিসুখ সমূলে বিনষ্ট করিয়া যাইবে, তাহা কি মা! বুঝিতে পারিতেছ না? নিজের স্বার্থের জন্য পরের ততোধিক স্বার্থে কুঠারাঘাত করা কি তোমার মত দয়াবতীর ধর্ম্ম? স্বার্থপরতার অঙ্কুর-পাতও তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আছে বলিয়া বিশ্বাস করি নাই। তবে আজ্ এমন করিয়া নিতান্ত নির্দ্দয়প্রাণে তুমি যাইতেছ কোথায়?

যাওয়া কি যায়? দেহ মন প্রাণ যাহাদের জন্য বলি দিয়াছিলে, তাহাদিগকে ফেলিয়া, আমাদের হৃদয়-মুকুরে তোমার প্রতিবিম্ব রাখিয়া, যাওয়া কি যায়? কায়া না থাকিলে ছায়া থাকে না সত্য; কিন্তু আজ্ তোমার কায়া না থাকিলেও ছায়া ছাড়িতে পারিব না। শুনিয়াছি একদিন ভক্তকুলচূড়ামণি অঞ্জনানন্দন বুক চিরিয়া হৃদয়ের অস্থি-পঞ্জরে "রাম নাম" লেখা দেখাইয়াছিলেন। সে কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে কোনও দিন সন্দেহ না করিলেও, আজ্ না হয় করিলাম। কিন্তু এ দীনহীন সন্তানের দেহ-পঞ্জরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে তোমার করুণার গাথা, স্নেহ মমতার অপূর্ব্ব স্মৃতি অলক্ষ্যাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মূর্ত্তির ছায়া, স্মৃতির চিহ্ন, অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যের পূর্ব্বানুভূতি রাখিয়া যাওয়া কি যায়? বায়ুবর্ত্মে ধূলিকণা ও পতনশীল পদার্থের গতিরোধ করিয়া থাকে; আর আজ্ হৃদয় পাতিয়া দিতেছি, শিশুকালের

মত আবদার করিয়া ধূলির পথে অন্তরাল হইতেছি, এ দেহপ্রাণ বিদলিত করিয়া জননি ! যাওয়া কি যায় ?

গেলেই কি যাওয়া যায় ? তোমার কার্য্য পড়িয়া রহিল, স্মৃতি পড়িয়া রহিল, স্নেহমমতা জড়াইয়া থাকিল, ঋণ জাল ছড়াইয়া থাকিল, তবুও তুমি যাইতেছ ; যাও, কিন্তু সে যাওয়ায় যাওয়া ত হইল না। যাও, কিন্তু তোমার স্নেহ ভুলিতে পারিব না। তোমার স্নেহের মূল্য নাই। এ জগতে অর্থ দিলে অথবা পদার্থের পরিবর্ত্তে পদার্থ মিলে, কিন্তু তোমার স্নেহ অর্থবলে মিলে না। আমি যে স্নেহামৃত সম্ভোগ করিতাম, অন্যে তাহা সম্ভোগ করে বটে, কারণ এই অমৃত হইতেই জীব-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে ; ইহা না হইলে সৃষ্টি প্রবাহ চলে না। তবে অন্যের অমৃত লইয়া আমার লাভ নাই। "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" আমাকে যাহাতে মর্ত্ত্য ধামে অমর সুখ দিয়াছিল, অমৃতের আস্বাদন দিয়াছিল, আমার তাহা তোমারই ধন, তুমিই লইয়া যাইতেছ। সংসারে স্নেহ-মমতার কত ছবি দেখি, কিন্তু যে ছবি মা আমাকে তুমি দেখাইয়াছিলে, তাহা আর দেখি না ! রোগশয্যার পার্শ্বে অনন্তচিন্তা সাধ্বীপত্নীর শুশ্রূষার শত চেষ্টার মধ্যেও যেন কি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাধকের আশীর্ব্বাদ সম্বলিত দেব-নির্ম্মাল্যের সহিত বৈদ্য-প্রদত্ত শাস্ত্রীয় ঔষধের যেরূপ প্রভেদ, মাতৃস্নেহের সহিত পত্নীর সেবার সেইরূপ কেমন একটা প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয়। স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশির মধ্যে মসলা না থাকিলে যেমন একটা অভাব থাকে, আত্মীয় স্বজনের স্তূপী-কৃত আদর যত্নের মধ্যেও তেমনই একটা অভাব থাকিয়া যায়। আমার জীবনযাত্রার খুটিনাটি গুলি তোমার মত অন্যে জানে না, জানিতেও

পারে না; আমার কখন্ ক্ষুধা পাইত, কত ভাতে পেট ভরিত, এসব গণনা আমার জীবনপালিকা তুমি ব্যতীত হয়ত অন্যে কেহ না জানিতেও পারে; না জানিলেও বিশেষ অতিরিক্ত কিছু ক্ষতি হয় বলিয়া মনে হয় না। তুমি যাহা দিয়া আমার রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে, অন্যের হাতেও তাহা অতৃপ্তিকর না হইতে পারে; তুমি যেরূপভাবে আমার শান্তির তরে সেবার ব্যবস্থা করিতে, অন্যের দ্বারাও তাহা সম্ভবপর হইতে পারে; সবই সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু সম্ভবপর হয় না একটা জিনিস—যাহা অপার্থিব, অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয়; সে তোমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে দেবত্ব ছিল, তুমি কাছে আসিলে যে স্বর্গীয় ভাব মনে জাগিত, তোমার হাতখানি গায়ে দিলে সর্ব্বাঙ্গে যে অমৃতাভিষেক করিত। তোমার কথা মনে হইলে যে অনন্নুভবনীয় অথচ অবর্ণনীয় মধুর ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। বহু নদীজলে স্নান করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও গঙ্গাস্নানের মত তৃপ্তি পাওয়া যায় না, বহুস্থানে পূজায়োজন করিলেও সে সব স্থানে পীঠ মন্দিরের মত অপূর্ব্ব দৈবভাবের উদ্রেক হয় না; বহুজনের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায়ও সাধক-সান্নিধ্যের মত পবিত্রতা আনয়ন করে না। শাস্ত্রে যাহাকে স্থান-মাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য বা প্রকৃতিমাহাত্ম্যের ফলশ্রুতি বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তোমার সংস্পর্শেও সেইরূপ একটি অপূর্ব্ব অকৃত্রিম দৈবভাব ছিল, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি প্রাপ্তব্য নহে। তাই বলিতে ছিলাম, তোমার প্রকৃতির—তোমার স্নেহের মূল্য নাই।

তোমার ঋণ অপরিশোধ্য। ঋণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ এবং তাহা দ্বিবিধ

উপায়ে পরিশোধিত হইবার পদ্ধতি আছে। অর্থের ঋণ অর্থ বা কার্য্য দ্বারা এবং কার্য্যের ঋণ কার্য্য বা অর্থ দ্বারা পরিশোধিত হয়। তোমার ঋণ অর্থের ঋণ নহে, অর্থের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, অর্থে তাহার বিনিময় চলে না। তোমার ঋণ স্নেহের ঋণ, স্তন্যের ঋণ, জীবনের ঋণ, পালনের ঋণ। তোমার অপরিসীম ঋণ—অপার্থিব কার্য্যের ঋণ। অন্যের কার্য্যের ঋণ নহে, ইহা তোমার কার্য্যের ঋণ, আমার জননীর—আমার জন্মারাধ্যা দেবীর কার্য্যের ঋণ। অন্যের কার্য্যের ঋণ হইলে, কার্য্য বা অর্থ দ্বারা ইহা পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল। তোমার ঋণ প্রথমতঃ কার্য্যে পরিশোধ করা যাইবে না; কারণ জননীর কার্য্য জননীই জানেন, জননীই করেন; অন্যে জানে না—করিতেও পারে না। তুমি জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি; কার্য্য তাঁহারই, তুমি অবলম্বন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ কথা এই, তোমার কার্য্যের ঋণ অর্থদ্বারা পরিশোধ্য কিনা। অন্য কার্য্যের কথা ধরিলেও দেখা যায়, মানুষে কোন কার্য্যের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ নহে। বেতন বা পুরস্কার প্রভৃতি উপায়ে কার্য্যের মূল্য অর্থের দ্বারা দিবার প্রথা আছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায় যে মানুষে মানুষে বিবাদ বিসম্বাদ এবং পারস্পরিক অসন্তুষ্টির ইহাই একটা প্রধান কারণ। তবুও অর্থ দ্বারা অন্য কার্য্যের নির্দ্ধারণ ব্যাপার কতকটা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তোমার কার্য্য পারমার্থিক কার্য্য, তাহার মূল্যের নিকটবর্ত্তী হইতেও অর্থের সামর্থ্য নাই। শুনিয়াছি আমাদের দেশে একজন মাতৃভক্ত পুরুষ, জীবনে যাহা কিছু অর্থসঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে মাতৃনামে একটি সুন্দর অত্যুন্নত

মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একদা ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ কিঞ্চিৎ গর্ব্বভঙ্গিতে বলিয়াছিলেন—"আজ্ আমার মাতৃস্তন্যের একধারের ঋণ শোধ দিলাম।" বলিতে না বলিতে মন্দিরের চূড়াটি ভগ্ন হইয়া পড়িয়া গেল ; এখনও সেই ভগ্ন মন্দির এক ভগ্নহৃদয়ের অনুশোচনার সাক্ষ্য দিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টকখানি পর্য্যন্ত জীবন্ত সাক্ষীর স্বরূপ—বলিতেছে যে "মাতৃঋণ একেবারেই অপরিশোধ্য।" ঘটনাটি কাহারও নিকট বিশ্বাস্য এবং কাহারও নিকট উপহাস্য হইতে পারে! কিন্তু ইহার মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা কখনও উপেক্ষিত হইবে না। মাতৃঋণ চিরকালই অপরিশোধিত রহিয়া যাইবে।

মা! তোমার কাছে যাহা পাই, সেত ঋণ নহে, সে ত তোমার দান—তোমার অযাচিত অপরিমিত দান। ঋণের দুইটি লক্ষণ আছে ; প্রথমতঃ ঋণ সময় সময় প্রার্থনা মত প্রদত্ত হয়, তাহা যখন তখন অযাচিত ভাবে প্রদত্ত হয় না। তোমার নিকট যে স্নেহ বা কৃপা পাইয়াছিলাম, তাহার জন্য কখনও আমাকে প্রার্থনা করিতে হয় নাই, তুমি অপ্রার্থিত ভাবে অজস্র দিয়াছ ; তোমার স্নেহমমতার কোন সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল না, তাহা নিসর্গ-নির্ঝরের মত অবিরত ক্ষরিত হইয়াছে। সে কি কখনও ঋণ হইতে পারে? বর্ষাগমে মেঘমালা যখন বর্ষণে ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত করিয়া দেয়, তখন তাহারা কি কাহারও প্রার্থনার অপেক্ষা রাখে? না, অন্যের ইচ্ছা দ্বারা সে বর্ষণের কাল নিয়মিত হয়? মেঘের বর্ষণ যদি ঋণ না হয়, তাহা হইলে তোমার স্নেহবর্ষণও ঋণ নহে, সে তোমার দান। দ্বিতীয়তঃ ঋণের বেলায় একটা পরিশোধের প্রত্যাশা থাকে ; ঋণ যিনি দেন, তাহার একটা স্বার্থের পিপাসা এবং বিনি গ্রহণ

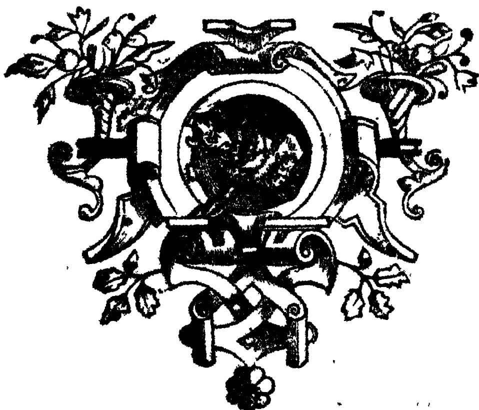
করেন, তাহার একটা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে। তোমার ঋণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য; তুমি তাহা কিছু পাইবার প্রত্যাশায় দেও নাই, সে ঋণ পরিশোধের দুরাশাও কখন আমার মনে জাগে নাই। সুতরাং তুমি যাহা দিয়াছ, তাহা ঋণ বলিয়া গ্রহণ বা চিন্তা করা আমার কর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ঋণ নহে। তুমি দিবার জন্যই আসিয়াছিলে, দিয়াই তোমার সুখ ছিল, তুমি আমরণ দিয়াই গিয়াছ—স্বামীতে সেবা, সন্তানে স্নেহ, স্বজনে প্রীতি, পোষ্যে কৃপা, প্রতিবেশীতে সান্ত্বনা, সংসারে আনন্দ, এবং গৃহে পবিত্রতা—এ সকল দিয়াই চলিয়া গিয়াছ—এসকল দেওয়াই তোমার ধর্ম্ম ছিল। মেঘের বর্ষণে সুখ এবং পুষ্পের সুবাস দিয়া সুখ, তোমার স্নেহমমতা বিতরণ করিয়া সুখ ছিল। তোমার সে দানে ভাসিয়া গিয়াছি, তোমার সে সুখ দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। "ধন্য" হওয়াটা বন্য কথা; অন্য কথা যে পাই না, সে আমার জ্ঞান বা ভাষাদৈন্য ভিন্ন আর কিছু নহে। তোমার স্নেহাভিষেকে যে যখন তখন কি হইয়া গিয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। তোমার নিকট যাহা পাইয়াছি, তাহা কখনও ফিরাইয়া দিব, দিবার ক্ষমতা আমার হইবে বা হইতে পারে, এবম্বিধ অসম্ভব কল্পনা আমার মনে জাগে নাই। তোমার দান না পাইলে মা! আমি যে কখনও "আমি" হইতাম না, তোমার আমিত্ব ভাসাইয়া দিয়া তুমি আমার আমিত্বের সৃষ্টি করিয়াছ; আজ্ সে আমিত্বের কথা ভাবিতে গিয়া আমার "আমিত্ব" উড়িয়া যায়, আমাতে আমি থাকি না—একেবারে আত্মহারা হইয়া যাই। জীবনে যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, তবে এমনি আত্মহারা থাকিতে চাই—তোমার ঋণ দিতে চাহি না—

তোমার ধ্যানে জন্ম জন্মান্তরেও ডুবিয়া থাকিতে চাই। এমন সমাধি—এমন সাধনা—আমার আর কিছু নাই।

তবে যাও মা! তুমি যাইতেছ; নিশ্চয়ই যদি যাইবে, যাও। কালের গতি অবিরাম, তাহার বিধি অনিবার্য্য এবং প্রভাব অপ্রতিহত। আমার সাধ্য কি তোমাকে বাধা দিব? তুমি নিশ্চয়ই যখন যাইবে, ফিরিতে চাহিলেও যখন ফিরিতে পারিবে না, তখন যাও। যাও মা! কিন্তু আবার আসিও। আবার আসিও, বার বার শতবার আসিও। শুষ্ক বালুক্ষেত্র যেরূপ শতবার সলিলধারা পাইয়াও তৃপ্ত হয় না, আমাদের মত নিরাশ্রয় জনের শুষ্ক হৃদয়ও সেইরূপ অসংখ্য বারেও তোমার স্নেহ ধারায় তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। স্নেহ-বিধুর হৃদয়, মাতৃ-হীন শিশু, রোগাতুর পথিক, বিপন্ন গৃহস্থ, তৃষিত কণ্ঠ, ক্ষুধিত জঠর, এবং শোকার্ত্ত জীবনের অভাব নাই। তুমি আসিয়া, মা হইয়া, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিও। তাহাদের অশ্রুজল মুছাইতে, আর্ত্তনাদ নিবারণ করিতে, প্রাণে আশ্বাস ও হৃদয়ে বিশ্বাস দিতে, মা তুমি আবার আসিও। আমরা উদ্বোধন জানিনা, শুধু মা বলিয়া ডাকিয়া বলিতেছি, মা! আবার আসিও। আর তুমি যাইবার সময় একটি প্রাণের প্রার্থনা এই, তোমাকে হারাইয়াও আমি যেন মা হারা না হই। মা-নামের অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী শক্তিতে আমার হৃদয় যেন প্রতিমুহূর্ত্তে উদ্দীপ্ত ও উদ্বোধিত থাকে। মা-বুলির মত সিদ্ধ মন্ত্র আর নাই। লক্ষ সাধকের সাধনঃ বলে সঞ্জীবিত, লক্ষ জাপকের উচ্চারণ ফলে পবিত্রীকৃত, লক্ষ সন্তানের কাতর ক্রন্দনে অশ্রুসিক্ত এমন মন্ত্র আর নাই। মা নামে কুচিন্তা দূরীভূত হয়, কামাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, পিপাসা নির্ব্বাপিত হয়;

মা নামে ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, হৃদ্বৃত্তি বিশুদ্ধ হয়, ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্‌বুদ্ধ হয়। এমন নাম আর কি কিছু আছে ? যে নারী হৃদয় পাপের কুক্ষিতলে নিমজ্জিত হইয়াছে, পাপের হাটে আত্মবিক্রয় করিতে বসিয়াছে, সেও মা নামে চমকিত হয়, মা রবে স্নেহ-প্রবণ হয়, মা মন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হয়। যেখানে আছে শুধু কঠোর হৃদয়ের তীব্র মূর্ত্তি এবং নির্দ্দয়তার লীলাক্ষেত্র, সেখানেও মা বুলি লইয়া উপস্থিত হও, প্রাণের পরিচয় পাইবে, স্নেহের উৎস ছুটিবে, কৃপার আশ্রয় মিলিবে। যেখানে দেখিবে বিকৃত হৃদয়ের দুর্দ্দম্য আন্দোলন, জাগতিক প্রেমের অসাধ্য রহস্য, সেখানেও মাতৃনামের ঔষধ প্রক্ষেপ কর, অচিরে সকল আন্দোলন মিটিয়া যাইবে, সকল রহস্যের সুমীমাংসা হইবে, সন্দেহ ঘুচিয়া শান্তির লীলা প্রবর্ত্তিত হইবে। মা নামের মত এমন সুন্দর মন্ত্র, সুকৌশল যন্ত্র, অসাধ্য সাধনকারী তন্ত্র আর নাই। মা ! তুমিই আমার এই মন্ত্রের উৎপত্তি স্থল। তোমারই মুখে এই মন্ত্র প্রথম শুনিয়াছিলাম, তোমাকেই এই মন্ত্রে প্রথম ডাকিয়াছিলাম, তোমারই প্রকৃতি দেখিয়া এই মন্ত্রের দেবতা প্রথম বুঝিয়া লইয়াছি। তুমিই এই মন্ত্রের দীক্ষা গুরু, তুমিই এই মন্ত্রের সজীব মূর্ত্তি, তুমিই এই মন্ত্রের ইষ্ট দেবতা। এই গুরু, মন্ত্র বা দেবতায় কোনও প্রভেদ কখনও মনে হয় নাই। আজ গুরু তুমি যাইতেছ, দেবতা তুমি অন্তর্হিত হইতেছ, কিন্তু মন্ত্র যেন যায় না। মন্ত্র থাকিলে সবই পাইব, মন্ত্র গেলে কিছুই থাকিবে না। তাই মন্ত্র যেন যায় না। আশীর্ব্বাদ কর মা ! আমার এই মা মন্ত্র যেন সিদ্ধ হয়। স্ত্রী মাত্রে এই মাতৃভাব যেন পূর্ণ মাত্রায় জাগে, মাতৃবুদ্ধি লইয়া যেন আমি জগতে বিচরণ করি, মাতৃস্নেহ লইয়া যেন আমি জগতের অশ্রু মুছাইতে

অগ্রসর হই। মায়ের প্রেমে ডুবিয়া, মায়ের গুণ গাহিয়া, মায়ের নামে নাচিয়া, আমার এই সংসারের নাট্ট-রঙ্গ যেন সমাহিত হয়। আমার অগ্রে মা, পার্শ্বে মা, পশ্চাতে মা, হৃদয়ে বাহিরে—জনমে জনমে যেন মায়েরই মূর্ত্তির শত পট পরিবর্ত্তন দেখি। আশীর্ব্বাদ কর মা! যেমন মায়ের নাম লইয়া ভাসিয়াছি, যেমন মায়ের নামে আত্মহারা হইয়া চলিয়াছি, তেমনি অন্তিমে—এ পাপ জীবনের শেষের সে দিনে, যেন মা নাম লইতে লইতে মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়ি।



মা ! তুমি কোথায় বা নাই ?

মা ! বিশ্বজননি ! চির জীবন ধরিয়া ভাবিতেছি—তুমি কোথায় আছ, কোথায় বা নাই। এ সংসারে সঙ্ সাজিয়া, কতবার আসিতেছি, কতবার যাইতেছি। প্রতিবারই আসিয়া ভাবি, কত স্থান কত দ্রব্য যেন পূর্ব্ব হইতে কত পরিচিত রহিয়াছে। কিন্তু যত বার আসি, তোমারই মূর্ত্তিতে, তোমারই কোলে আশ্রয় না পাইলে আসিতে পারি না। মায়ের উদরে স্থান পাইয়া, মায়ের শোণিতে জীবন পাইয়া, জগতে আসিয়াছি। স্নেহের কোলে হাসিয়া নাচিয়া জীবনের সকাল বেলা গিয়াছে। যতটুকু বয়স হইয়াছে, তাহাতে এইটুকু সার বুঝিয়াছি, মা ছাড়া জীবন অসম্ভব, মায়ের তুল্য সুহৃৎ অসম্ভব, এ কঠোর কর্কশ নীরস জীবনে মাতৃস্নেহের মত উপভোজ্য অসম্ভব। পঞ্চ বর্গের শেষ বর্ণ যেরূপ আকার প্রাপ্ত হইলে 'মা' হয়, পঞ্চভূতের জীব দেহেও তুমি আকারপ্রাপ্তা হইয়া 'মা' হও। শুধু আমার বেলায় নহে, সর্ব্ব জীবের বেলায় ঐ একই কথা। সর্ব্বত্র একই মাতৃশক্তি, মাতৃপ্রকৃতি এবং একই মাতৃস্নেহে জগৎ রক্ষা করিতেছে। এই শক্তি এবং স্নেহাসক্তি একই কেন্দ্র—একই হৃদয় হইতে না আসিলে, এরূপ একই ভাবে কার্য্যকরী হইত না। সে শক্তিসমূহের অধিশ্রয়ণ-ক্ষেত্র, সে আসক্তি সমূহের কেন্দ্রস্থল কোথায় ? সে ত মা ! তোমারই হৃদয়। সেই হৃদয় হইতে সব আসে, কাজেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সেই হৃদয়েরশক্তিই ভাসে। তাই মনে ভাবি, তুমি কোথায় আছ, কোথায় বা নাই।

প্রকৃতির অঙ্গ হইতে তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত ব্যাকুল

হই। বুঝি, তুমি সে অঙ্কের তটে তটে আছ কিন্তু সহজে দেখা দিতে চাও না। তুমি মা! পলকে পলকে নয়ন কোণে দেখা দাও, কিন্তু দেখিব বলিয়া দেখিতে গেলে, পলকে কোথায় লুকাও। বিশাল বিশ্ব তোমারই সঙ্গীত স্বরে সর্ব্বদা মুখরিত, কিন্তু আমার কর্ণপটহ তাহার কোন বিশেষ ধারণা করিতে পারে না। তোমার সৌরভ-গৌরবে কুসুমকুল প্রফুল্ল হয়, গন্ধবহ গর্ব্বিত হয়, দিক্‌সমূহ আমোদিত হয়, কিন্তু আমি নাসা-রন্ধ্রে তোমাকে চিনিতে পারি না। কাননে, উদ্যানে তোমারই পুষ্পাধরে তোমারই মুখের মধু বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, মাতৃমাত্রেরই বক্ষে বক্ষে তোমারই স্তন্যসুধা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, শর্করার অণু পরমাণুতে তুমি সুধারূপিণী হইয়া বিরাজ করিতেছ সেই মধু—সেই সুধা—স্তন্য লইয়া পান করিয়া কত তৃপ্তি পাই, তবুও বুঝি না সে অমৃতের ভাণ্ড কোথায়? তুমি ত স্পর্শ করিয়াই আছ, শিশুকাল হইতে ত মায়ের কোলেই আছি, কোল ছাড়া ত কখনও হই নাই। শিশুকালে যখন হাটিতে শিখিয়া, জননীর কোল হইতে ধরাবক্ষে নামিয়া পড়িলাম, সে দিন দেখিলাম, মা বসুন্ধরার মত সর্ব্বংসহা আমার গর্ভধারিণীও ছিলেন কিনা সন্দেহ। শৈশবে মলমূত্র ত্যাগে বা পদপীড়নে সময়ে সময়ে জননীর মুখেও বিরক্তির চিহ্ন সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু ধরিত্রীর চিরস্থির বদন মণ্ডলে অনুরক্তি ভিন্ন অন্য কোন রেখা প্রতিভাত হয় না। তোমার স্পর্শ ত প্রতি পদক্ষেপেই অনুভূত হইতেছে। তোমার মৃদুল অঞ্চলে, তোমার কোমল ছায়ায়, তোমারই কোমল করের পরিচয় পাইতেছি। একমাত্র তোমারই লীলা খেলাই আমার ইন্দ্রিয়গ্রামের বিষয়ীভূত।

ভূমণ্ডলে যে কোন দেশে, যে কোন স্থানে, যে কোন বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হই, সেইখানেই নানা ছন্দে নানা ভাবে তোমার অস্তিত্বের অনুভূতি হয়। প্রান্তর পথে পরিশ্রান্ত দেহে ভ্রমণ করিতে করিতে মন্দ মলয় মারুতের সঙ্গে দেখা হয়; সে যখন তোমারই নিশ্বাস গন্ধে ভরপুর হইয়া স্নেহ কোমল আলিঙ্গনে দেহ স্পর্শ করে, তখন আনন্দ ও উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে হয়। নিদাঘদগ্ধ হইয়া অশ্বথ বা বটবৃক্ষ মূলে পত্র-শয়নের আশ্রয় লইয়া কত অপরাহ্ন অতিবাহিত করিয়াছি। তুমি সেই সকল বিশাল অশ্বথ বৃক্ষের কোটি কোটি পত্রের প্রত্যেকটিতে তোমার অপূর্ব্ব কৌশল রচনা করিয়া রাখিয়াছ। পত্রগুলি শাখাগ্র হইতে এক একটি দীর্ঘ নমনীয় বৃন্তে এমন ভাবে লম্বমান থাকে যে তাহারা মনুষ্য নিশ্বাস তুল্য সামান্য বায়ু প্রভাবে ও সহজে সুকৌশলে সঞ্চালিত হয়; একটি আর একটির সঞ্চালনের কারণ হয়, স্বীয় স্বীয় গাত্র সংস্পর্শ হইতে সঞ্চালিত বায়ুতে একটু একটু শৈত্য প্রদান করে এবং ক্রমে বেগের একটু মাত্রাবৃদ্ধি করিয়া দেয়; ক্রমে পত্রে পত্রে শৈত্য ও বেগ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে, ঝির ঝির শব্দে সমস্ত বৃক্ষ কাঁপাইয়া তুলে এবং নিমেষে অন্যত্র বাতাস না থাকিলেও সেই বিরাট বৃক্ষাশ্রয় শীতল বাতাসের ক্রীড়াভূমি হইয়া বসে। আতপ ক্লিষ্ট পথিক তোমার চেলাঞ্চলের অচঞ্চল ছায়া ত পায়ই, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহস্তের কোমল ব্যজনে নন্দন-সুখ অনুভব করে। এ জগতে মা! কোনও প্রকার মনুষ্য-রচিত কৃত্রিম কৌশলে তেমন শীতল ছায়া, তেমন স্নেহের আশ্রয়, তেমন মধুর ব্যজন মিলে কি?

পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি অজস্র অবশ এবং সর্ব্ব

শরীর ক্লান্ত, কম্পিত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আবার তখনই দেখিয়াছি— প্রস্তর বক্ষে ছায়ার অন্তরালে কে যেন কাটিয়া ছাটিয়া সুন্দর পর্য্যঙ্ক রচনা করিয়া রাখিয়াছে; তাহাতে শয়ন করিলে শরীর স্নিগ্ধ, শীতল ও সবল হয়। তৃষিত কণ্ঠ লইয়া অনুসন্ধান করিলেই দেখি তুমি আমারই নিকটে স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ উৎসের সৃষ্টি করিয়াছ। অঞ্জলি পূরিয়া তোমার অযাচিত দান স্বরূপ অজস্র প্রবাহ হইতে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া যখন কণ্ঠশোষ বিদূরিত করি, শরীর শীতল হয় এবং তৃষ্ণা মিটে; তখন স্পষ্টতঃ মনে হয় তোমারই পর্ব্বত-বক্ষে সেই সমুন্নত শিখর-পয়োধরে তোমারই স্তন্যসুধা পান করিতেছি। সে পানে যে পবিত্র শান্তি ও পবিত্র চিন্তার উদ্রেক করে তাহার তুলনা নাই। সুবিস্তীর্ণ অদ্রি-পৃষ্ঠে শিখর প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, কিরূপে দুই তিনটি উৎস-নীরে একটি পার্ব্বত্য সরিৎ উদ্ভূত হয় এবং কিরূপে দুই চারিটি সরিতের সম্মিলনে একটি নদীর সৃষ্টি করে। সেই নদী খরবেগে ঘোররবে নিম্নে অবতরণ করে, আমার চিন্তাতরঙ্গিণীও সঙ্গে সঙ্গে ধায়। বসিয়া বসিয়া দেখিয়া দেখিয়া কত দূরের কথা কত ভবিষ্যতের চিন্তা লইয়া সময় কাটাইয়াছি। পর্ব্বতের উপর যে জলবিন্দু পতিত হয়, তাহার সহিত বহু দূরবর্ত্তী সাগরের কি সম্বন্ধ? জলবিন্দু যেখানেই পতিত হউক না কেন, তাহার গতি সাগরের দিকে। সে ত মিলিয়া মিশিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া কোন প্রকারে সরিতে পড়িয়া অবশেষে সাগর পানে ধায়। দেশ দেশান্তরে বাধার উপর বাধা অতিক্রম করিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া সে ত শেষে সাগরে গিয়া মিশে। এ যদি সত্য হয়, আমার মত ক্ষুদ্র ক্লান্ত জীবের তোমাতে মিশিবার সাধ অন্যায় কিসে?

নানা পথ প্রধাবিত জীবগণের তুমিই ত একমাত্র গতি—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং ।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

আত্মাই জলবিন্দু ; দেহ তাহারই বুদ্বুদ ; জল না হইলে বুদ্বুদ হয় না ; বুদ্বুদ জলেই বিলীন হয় ; আত্মাই মায়িক দেহের কল্পনা করিয়া লয়, দেহান্তে আত্মাই থাকে। তুমি অনন্ত শক্তিশালিনী, অনন্ত সাগররূপিনী এবং অসীম দেহধারিণী। জলের বেগ ত মা ! তোমারই প্রতি আকর্ষণ ; সে আকর্ষণ অতীব স্বাভাবিক। আমাকে স্বাভাবিক স্বত্বে বঞ্চিত না করিয়া একবার তোমার পানে ছুটিতে দাও তোমার বুকে মিশিতে দাও।

জলবিন্দুসমূহের সেই শেষ সমাধিস্থল সাগর ও দেখিয়াছি। কতদিন বেলাভূমিতে বসিয়া, বসিয়া, বসিয়া, বিশাল বারিধির লহরী গণনা করিয়াছি। দেখিয়াছি—যতদূর দৃষ্টি যায়, বহুদূরবর্ত্তী দিগ্বলয়প্রান্ত পর্য্যন্ত অনন্ত জলধির জীবন্ত চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছি—উদ্বেল, ফেনিল, বিশাল আবর্ত্তময় নীলাম্বুরাশি—সে ত মা ! ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরি ! তোমারই বিরাট উদরাংশ মাত্র। মনুষ্যোদরের মত তাহার ও বিরাম নাই—তরঙ্গাভিঘাতযুক্ত হইয়া যেন শ্বাসক্রিয়ার জন্য সতত উন্নতাবনত হইতেছে ; আর সে অনন্ত কুক্ষিতলে কত যে পাহাড় পর্ব্বত, জীবজন্তু, মণিমাণিক্য লুক্কায়িত বা উদ্বেলিত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। উদরে অগ্নি থাকে সে সমুদ্রেও বাড়বাগ্নি আছে ; উদর হইতে যেমন শোণিত উৎপন্ন হইয়া প্রথমে ঊর্দ্ধমুখে হৃৎপিণ্ডে যায়, পরে তথা হইতে সহস্রধারায় শরীরের সর্ব্বত্র পরিব্যপ্ত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারা শরীর সজীব

সরল ও জননশীল হয়; সেইরূপ তোমার সে বিশাল সমুদ্রোদর হইতে অবিরত মেঘরাশি সমুত্থিত হইয়া নভস্তলে সমবেত হইতেছে, তথা হইতে অনন্তধারায় সমগ্র পৃথিবীকে অভিষিঞ্চিত করিতেছে এবং তদ্দ্বারাই ভূপৃষ্ঠ সরস, শ্যামল ও সমুর্ব্বর হইতেছে। উদরান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ শ্বাসগর্জ্জন নিয়ত অনুভূত হয়, সমুদ্রের ও উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ একপ্রকার গভীর মন্দ্র সর্ব্বদা দিগ্‌বিদিক্ প্রকম্পিত করিতেছে। কর্ণরন্ধ্রে জগতের সকল শব্দের গতি বন্ধ করিলে, যে এক অদ্ভুত নিঃস্বন অবিরাম গতিকে শুনিতে পাওয়া যায়, সংসারের সকল শব্দ ত্যাগ করিয়া, সাগরোপকণ্ঠে বসিলেও সেইরূপ গম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হয়। সে অব্যক্ত ধ্বনিতে মা! তুমি কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত ব্যক্ত করিতেছ, তাহা মানুষের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য। যে সঙ্গীত অনন্তশূন্যে ব্যোমমণ্ডলচারী গ্রহনক্ষত্রের গতির সঙ্গে সঙ্গে গীত হইতেছে, যে সঙ্গীত অনন্ত বিস্তৃত অপার জলধি অব্যক্ত আরাবে গাইয়া যাইতেছে, যে অশ্রুত সঙ্গীত অনিলের সঞ্চালনে জগতের দ্বারে দ্বারে ধ্বনিত হইতেছে, যে অননুভূত সঙ্গীত মনুষ্য-হৃদয়ে শ্বাসে প্রশ্বাসে অজপাজপে সোহং ধ্বনিতে জীবেশিবে একীভূত করিয়া দিতেছে, সে সঙ্গীত তুমিই গাহিতেছ,—সর্ব্বভূতের শক্তিরূপিনি! গীতিরূপিণি! মা! তুমিই গাহিতেছ। ঐ সঙ্গীতস্বরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মোহমুগ্ধ জড় প্রায় হইয়া তোমারই মন্ত্রে তোমারই হস্তে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নৃত্য করিতেছে।

জগতের শব্দের মধ্যে যেমন তোমারই স্বর, জগতের দৃশ্যে তেমনই তোমার রূপ সপ্রকাশ রহিয়াছে। ঋতুর পর ঋতুতে, মাসের পর মাসে তোমারই ইচ্ছার পরিবর্ত্তনে জগতের বেশভূষার পরিবর্ত্তন সাধিত

হইতেছে। তন্মধ্যে কোন কোন দৃশ্যে এতই পরিস্ফুটরূপে তোমারই সৌন্দর্য্য বিজ্ঞাপিত করিয়া দিতেছে যে নিতান্ত অন্ধ না হইলে তাহা অলক্ষিত থাকে না। বৈশাখে নবীন মেঘের কৃষ্ণচ্ছায়ায়, জ্যৈষ্ঠে বিশ্বমণ্ডিত মার্ত্তণ্ড প্রভায়, আষাঢ়ে সেফালিকার পুষ্পশয্যায়, শ্রাবণে নদনদীর গৈরিক কায়ায়, ভাদ্রেতে কাশ-কুসুমের শ্বেত তরঙ্গে অথবা ধান্যক্ষেত্রের শ্যামল অঙ্গে, আশ্বিনে সরসীর সরোজ শোভায়, কার্ত্তিকে সর্ষপক্ষেত্রের পীতছটায়, অগ্রহায়ণে সুপক্ক শস্যের অনপেক্ষ রূপে, পৌষে অদ্রির-শিখরে রজত-ধবল তুষারস্তূপে, মাঘে পলাশ পুষ্পের দেশব্যাপী বর্ণ গৌরবে অথবা সহকারের দেশব্যাপী মুকুল বৈভবে, বাসন্তী ফাল্গুণে কিংশুকের রক্তাংশুক ছটায়, চৈত্রে বৃক্ষাবল্লীর নবকিশলয় সমৃদ্ধ হরিৎ প্রভায়—মা! কোথায় বা তুমি নাই ? যখন যে দিকে চাই, তোমাকেই ত দেখিতে পাই, সর্ব্বত্র তোমারই বিবিধবর্ণের চেলাঞ্চলের প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্যভাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শরৎ আসিলে, জগৎ হাসিলে, সরসী সলিলে প্রফুল্ল কমলে কাহার রক্তিম কপোল-রাগ দেখিতে পাই ? বসন্তানিলে মন্দান্দোলিত হইয়া মল্লিকা কাননের রাশি রাশি ফুল্লপুষ্পে কাহার সরস শুভ্র হাসির লহরী ফুটিয়া উঠে ? নিশির শিশির বিন্দুতে উষারুণ-রাগে পুলকে কাহার নোলক দোলে ? চম্পকের স্বর্ণবর্ণ কলিকা-স্তবকে কাহার অঙ্গুলির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় ? বৈশাখী গগনে বায়ুকোণে কালো মেঘের সৃষ্টি হইলে ভূতল কালিমা মণ্ডিত এবং মনুষ্য হৃদয় আতঙ্কিত হয় ; সঙ্গে সঙ্গে যখন নয়ন ধাঁধিয়া ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা খেলিতে লাগে, তখন বুঝিয়া পাই না, তুমি আমার কালী মা সেই জলধর-পটলের কালিমায় অথবা নৈরাশ্যের মধ্যে আশার মত,

অবিদ্যার মধ্যে জ্ঞানের মত, পাপীর চিত্তে সিদ্ধমন্ত্রের মত, সেই মেঘের কোলে সৌদামিনীর লীলা ভঙ্গিতে প্রকটিত হও। মায়ের কোলে শিশু হাসে; শিশুও হাসে, মাও হাসে; স্নেহের পবিত্র তরঙ্গ ভাসিয়া উঠে; তুমি মা! তখন সেই মায়ের স্নেহে কি শিশুর দেহে অবগুণ্ঠিত থাক, তাহা খুজিয়া পাই না। ফলভারাবনত সহকারের পল্লব-বিতানে বসন্তের কোকিল পঞ্চম তানে স্বরলহরী তুলিয়া যখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন বুঝিয়া পাই না, কোথায় কি দেখিব? সেই ফলভারনম্র তরুতনুতে মায়ের ধীর গম্ভীর মূর্ত্তি, সেই মধুময় ফলের রসে মায়ের মুখামৃত কিম্বা সেই কোকিলের স্বরগ্রামে মায়ের স্নেহের কণ্ঠ,—কোথায় কি লইব, কি সবই লইব, কিছুই বুঝিতে পারি না, দিশেহারা হইয়া যাই। ভাবি, তুমি কোথায় বা নাই!

মা, তুমি সর্ব্বত্র আছ; যেন আমারই পাছে পাছে কাছে কাছে রহিয়াছ; যেখানে যাই, সেইখানেই তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাও, যেখানে বসি, তুমিও সেইখানে অবস্থান কর। মনে হয়, তোমার যেন অন্য কাজ নাই, তুমি সর্ব্বদা আমাকে লইয়াই ব্যস্ত। শিশুকালে আকাশের চাঁদ লইয়া খেলা করিতাম; অপরকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে নিজে চাঁদ লইয়া দৌড়িয়া স্থানান্তরে যাইতাম; স্পষ্টতঃ দেখিতেও পাইতাম, যেন আমারই চাঁদ আমারই সঙ্গে সঙ্গে চলিল; ভাবিতাম, অন্যে চাঁদের আলো পাইবে না। কিন্তু চাঁদ সকলের বেলায় সমান; আমি যেরূপ আপাতদৃষ্টিতে আমার পাছে পাছে চন্দ্রের গতি দেখিতে পাইতাম, চন্দ্র প্রকৃতপক্ষে সেরূপ স্থানচ্যুত হয় না। এসব কথা আগে জানিতাম না; এখন জানি, কিন্তু এখন ও বুঝি না। মলয় যখন গায়ের উপর

বহে, তখন ভাবি সে বুঝি আমার প্রতি পক্ষপাতী; কিন্তু বুঝিনা যে সে নিজের ধর্ম্ম নিজে পালন করিতেছে; তাহার ধর্ম্মের পথে কর্ম্মের ফলে আমি যখন পড়ি, তখন নিজেই ধন্য হই; মলয়ের তাহাতে কিছুই আসে যায় না। মা! তোমার বেলায় ও আমার সেইরূপ যে সব ধারণা আছে, তাহা কোনও জ্ঞানের ফলে সুসংস্কৃত হয় না। আমি সর্ব্বদাই ভাবি, তুমি আমারই মা; তুমি যে অন্যেরও মা, তাহা বুঝিলেও বুঝি না, জানিলেও স্বীকার করি না। স্বীকার না করিয়াই যে সুখ আছে, তাহার মত সুখ নাই।

তুমি যে আমারই, এ কথা ভাবিব না কেন? যখন চাই, বা না চাহিলে ও যখন তোমাকে পাইবার প্রয়োজন হয়, তখনই যে তোমাকে পাই। ইহা ও দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার নহে; সর্ব্বদাই চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি। কর্ম্মবশে কোন সময় অভুক্ত থাকি; জঠরানল জ্বলে; ক্ষুধায় জর্জ্জরিত হই, শরীর কাঁপে, চোকে জল আসে,—অমনি তোমাকে ডাকি। প্রাণ ভরিয়া ডাকিবামাত্র দেখি, তুমি থাকিতে পার না। তোমাকে স্বশরীরে পাই না—কিন্তু পাই খাদ্য—মুখের তৃপ্তিকর মধুর খাদ্য। কোথা হইতে অকস্মাৎ কি ভাবে যে সেই খাদ্য আসে, তাহা বুঝি কিন্তু বুঝান কঠিন। সে খাদ্য গ্রহণ করিবার সময় এমন তৃপ্তি হয় যে বোধ করি, তুমি যেন হাতে তুলিয়া সন্তানকে খাওয়াইতেছ। মা! বিদেশে বহু অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াও এ বিষয়ে তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি। যেখানে যে খাদ্য জুটিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহাও হঠাৎ জুটিয়াছে। তুমি স্পষ্টতঃ দেখা দাও না বটে, কিন্তু খাদ্যরূপিণী হইয়া দেহে প্রবেশ কর এবং দেহযন্ত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তৃপ্তিসাধন করাও। তোমার মহিমা

অপার। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে শুইয়া পড়িয়াছি, কে ঘুম দিয়াছে জানি না। জাগিয়া বুঝিয়াছি, তেমন ঘুম যেন আর কখনও অনুভব করি নাই এবং ঘুমের ঘোরে স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছি, কে যেন কোমল করে ব্যজন করিয়া নয়নপট নিমীলিত করিয়া দিয়াছিল। বিপদে পড়িয়া, বিরক্তিকর কার্য্যে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইয়া, উদ্ধার পাইবার প্রত্যাশায় তোমাকেই প্রার্থনা করিয়া তোমারই চরণে শরণাগত হইয়াছি, ফলে সময় মত উদ্ধারও পাইয়াছি, কিন্তু যে পন্থায় যে ভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছি, তাহা যে কি প্রকারে কাহার দ্বারা উদ্ভাবিত হইল, তাহা ভাবিয়া পাই নাই। সামান্য একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপেই যেরূপ সরোবর বক্ষে বীচিরাজির সমুদ্ভব হয়, সেইরূপ সামান্য কথাতে, সামান্য ব্যথাতে বা সামান্য দৃশ্যে হৃদয়ের যে সতত কত প্রকার প্রশ্ন সমুত্থিত হয়, তাহার পার নাই। আমার মত মূর্খের শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা তর্ক দ্বারা, কিছুতেই তাহার মীমাংসা হয় না। কিন্তু অন্ধকারময় নিশীথে কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্রমা যেমন সহসা উদিত হইয়া ধান্তরাশি বিনষ্ট করিয়া দেয়, তেমনি, বুঝিতে পারি না কি ভাবে—সময় সময় আমার অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন চিত্তের মাঝে এমন একটি জ্ঞানের ভাতি—সে ত মা! তোমারই করুণার জ্যোতিঃ, ফুটিয়া উঠে যে তখন আমার সে সব সামান্য সমস্যার মীমাংসা ত হয়ই, পরন্তু এ সকল বিষয়ে সন্দেহ কেন হইল, তাহাই ভাবিয়া বিস্ময়ও উপস্থিত হয়। যে অপূর্ব্বভাবে সে সব সন্দেহ আসে আর যায়, তাহাতে সহজেই মনে হয়, তাহাদের উদয় বা বিলয় আমার ইচ্ছায় হয় নাই।

মানুষে কি করে? কিই বা করিতে পারে? তুমি যাহা মানুষকে দিয়াছ, সে সেই আপন গণ্ডাই বুঝিয়া লইতে পারে না, আর তোমার

মহিমা কি বুঝিবে ? মানুষে প্রাপ্ত গণ্ডা বুঝিতে না পারিয়া, অনর্থক শুধু আমি আমি রূপ ভণ্ডামি করে ; সেই ভণ্ড "আমি" যতদিন "তুমি"তে পরিণত না হয় ততদিন তাহার নিস্তার নাই। এ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব একটি সুন্দর কথা বলিতেন। গোবৎস জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই "হাম্বা হাম্বা" বা "আমি আমি" রব করিতে থাকে। জীবন ভরিয়া তাহার আমিত্বের অহঙ্কার যায় না। শেষে সে মরে, চর্ম্মব্যবসায়ী তাহার চর্ম্ম তুলিয়া লইয়া চর্ম্ম হইতে তাঁত প্রস্তুত করে ; ঐ তাঁত হইতে তুলা পিঁজিবার ধূনরী প্রস্তুত হয়। ধূনরীর সেই তাঁতের উপর মুদ্গর দ্বারা আঘাত করিয়া যখন তুলা পিঁজিবার কার্য্য চালান হয় তখন তাহা হইতে শব্দ হইতে থাকে—"না—না—তুঁহু, তুঁহু" ("আমি নহি, আমি নহি—তুমি—তুমি") অর্থাৎ গোচর্ম্ম যেন বলিতে থাকে যে এতদিন যে অম্বা বলিতে "হাম্বা" বলিয়াছি, মায়ের কথা না ভাবিয়া আত্মাহঙ্কারে ডুবিয়া রহিয়াছি, উহা ভুল—সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা ; মা ! এখন বুঝিতে পারিতেছি, আমি কিছুই নহি—তুমিই সব।" সংসারে মানবের মনে যতদিন সুন্দর ভাবে এই বুদ্ধির উন্মেষ না হয়, ততদিন তাহার নিস্তার নাই। মা ! তোমাকে চিনিতে না পারিলে যেমন তুমি অভিমান ভরে দূরে থাক, সেইরূপ তোমাকে চিনিতে পারিলে আমিত্ব-জ্ঞান ছাড়িয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তুমি দৌড়িয়া আসিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও। তোমাকে কে চিনিতে পারে বা কে চিনিতে পারে না, তাহা তাহারা জানে না, তাহা তুমিই জান। যে তোমাকে চিনিতে পারে না, সে সংসারে চিন্তা লইয়া আত্মহারা ; সুতরাং তোমাকে জানিবার বা না জানিবার জ্ঞান তাহার নাই ; আর যে তোমাকে চিনিতে পারে সে তোমার

চিন্তায় এমনই আত্মহারা থাকে, যে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। ভাগ্য-দোষে সে অবস্থার প্রত্যাশা আমার নাই। তবে যে জন্মান্ধ হইয়া মানব দেহ পাইয়াছি সে কি মা! শুধু আমারই দোষ? আর দোষ হইলেই বা দোষ কি? আমি ত কিছু নূতন নহি—কুপুত্র ত অনেকেই হয়; কিন্তু কুমাতা একজনও হয় না; তবে মা! আমার ভয় কি?

ভবের হাটে ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। কত জিনিস বাছিয়াছিলাম, লইতে পারি নাই। কত জিনিস লইয়া ছিলাম, রাখিতে পারি নাই। তোমার জিনিস, তুমি দাও আবার তুমিই লও; আমাদের শুধু বাছাবাছিই সার। তবুও মন বুঝে না বলিয়া বাছিয়াছি; তোমার চরণপ্রান্তের আশ্রয়কে শেষে সাধনা স্থির করিয়া প্রাণান্ত মূল্য হাতে লইয়া বসিয়া রহিয়াছি। শুনিয়াছি বিলাতে এক সীসমহল বা স্ফটিকগৃহ আছে; উহার ভিতর বিক্রয়ার্থ বহুদ্রব্য সজ্জীভূত থাকে; প্রবেশ করিলে কোথাও বিক্রেতা দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে সুকৌশলে দর্পণ সংস্থাপন দ্বারা এরূপ ব্যবস্থা আছে যে একজন বিক্রেতা দূরবর্ত্তী একটি প্রকোষ্ঠে থাকিয়া আগন্তুকের যাবতীয় গতিবিধি দেখিতে পারেন। ক্রয়ার্থী ব্যক্তি যখন কোন জিনিস বাছিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ জন্য ব্যস্ত হন, অমনি বিক্রেতা আসিয়া উপস্থিত হন। আমিও সংসারের রঙমহলে আসিয়া কত জিনিস সাজান দেখিলাম, কত জিনিস ধরিলাম, ছাড়িলাম এবং বাছিলাম, কিন্তু মালিক তুমি, তোমাকে পাইলাম না। কোথায় তুমি আছ কিছুই বুঝি না, কিন্তু সর্ব্বত্রই তোমার অস্তিত্ব, তোমার সুবন্দোবস্তের পরিচয় পাইতেছি। তুমি আছ তাহা জানি; তুমি সবই দেখিতেছ তাহা বুঝি আমার বাছিবার কার্য্য সারা হইয়াছে, এখন একবার এস। যাহা

বাছিয়াছি, তাহার মূল্য কি, একবার বলিয়া দাও; নিজের সামর্থ্যে যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা লইয়া আসিয়াছি; তোমার জিনিস তুমি দাও বা না দাও, আমার অর্থ—আমার যথা-সর্ব্বস্ব তোমারই হাতে দিবার জন্য বসিয়া আছি। মা! বিলম্ব না করিয়া, একবার এস।

তুমি নিজেই বলিয়াছ "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" তুমি এককই জগন্ময়ী হইয়া রহিয়াছ, তবুও তোমারে খুঁজিয়া পাই না। তুমি যখন জগতের সর্ব্বত্র আছ, তখন আমারও দেহের অণুপরমাণুতে আছ; তবুও তোমাকে খুঁজিয়া পাই না। যে মৃগের নাভিতেই কস্তুরী প্রস্ফুটিত হয়, সে আপনার গন্ধে আপনি বিভোর হইয়া, গন্ধ কোথা হইতে বাহির হইতেছে বুঝিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ ঘোর বেগে দৌড়িয়া বেড়ায়। সাধকেরও হৃদয়-রাসমন্দিরে তুমি ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে দাঁড়াইয়া থাক, তবুও তাঁহারা তোমাকে দেখিবার জন্য পাগল হন। পাগল কে নয়? বেদবেদান্ত, স্মৃতিপুরাণ, আগমনিগম তোমার তত্ত্বনির্ণয়ে পাগল, দেবর্ষি রাজর্ষি মহর্ষিগণ তোমার সন্ধানে পাগল, সাধুসন্ন্যাসী ভক্তোপাসক ব্রহ্মচারিগণ তোমার দর্শনের জন্য পাগল। আর আমি যে পাগল হইব, তাহাতে বিচিত্রতা কি? আমার পাষাণ-হৃদয়ে তোমার আসনের সম্ভাবনা নাই; তোমার কথা শুনিলাম বই তোমাকে দেখিলাম না; তোমাকে দেখি দেখি করিয়া দেখিলাম না, পাই পাই করিয়া পাইলাম না। আমার কি উপায় হইবে মা? জীবনের দিন ফুরাইয়া চলিল, শেষের দিন ঘনাইয়া আসিল, এ দীনের দীন উপায় কি করিবে মা?

সেবা ত সকলেরই করিয়াছি, করি নাই শুধু তোমার। ইন্দ্রিয়ের

সেবায় আত্মক্ষয় করিয়াছি, পরের সেবায় জীবনক্ষয় করিয়াছি, স্বজনের সেবায় ধনক্ষয় করিয়াছি, সেবা করি নাই শুধু তোমার। অর্থ-মৃগয়ায় দেশে বিদেশে ফিরিয়াছি, অনুগ্রহের অনুসরণে ঘরে ঘরে ঘুরিয়াছি, অনর্থের মূল অর্থের তরে যে আয়ুঃক্ষয় করিয়াছি, তাহা যদি তোমার তরে তোমার পথে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে আজ্ আমার এ দশা হইত না। সব বুঝিয়াই মা! একটা কথা বলিতেছি। দীপবর্ত্তিকা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সকল পদার্থকে আলোকিত করে, কিন্তু তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না বা সে প্রকাশিত হইবার জন্য অন্যের প্রত্যাশা রাখে না। তাই মা করুণাময়ি! তোমার কৃপারুণ-রশ্মিভাতি বিভাসিত করিয়া একবার নয়নপথে দাঁড়াও। আমার হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হইবে, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইবে, কর্ম্মবন্ধন ক্ষয়িত হইবে, * চর্ম্মচক্ষুর কর্ম্মকাণ্ড চরিতার্থ হইয়া যাইবে। তোমার সে বিরাট্ দৃশ্যের সন্নিকটে ব্রহ্মাণ্ডের লীলারহস্য বিলীন হইবে, ব্রহ্মাণ্ডের খণ্ডে খণ্ডে তোমার যে অখণ্ডিত মূর্ত্তি-প্রতিভা ফুটিয়া পড়িত, তখন তোমার বিরাট্ দেহের রোমবিবরে শত সহস্র ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া উঠিবে। ভীত, স্তম্ভিত, রোমাঞ্চিত, আনন্দে আত্মরহিত হইয়া গাহিতে কি পারিব ?—

ত্বং সর্ব্বশক্তির্জগতাং জনিত্রী ত্বং সর্ব্ব-মাতা সকলস্য ধাত্রী।
ত্বং বেদরূপাখিলবেদবাচ্যা ত্বং সর্ব্বগোপ্যা সকলপ্রকাশ্যা॥
দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

* "ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"